ন্যায়-দর্শন

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ

ন্যায়-দর্শন

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

পরম পূজ্যপাদ মদীয় অধ্যাপক

শ্রীলশ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র তর্কতীর্থ

মহাশয়ের শ্রীচরণে

নিবেদন

বঙ্গভাষায় প্রাঞ্জলভাবে ন্যায়দর্শনের বক্তা স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার মহাশয় ও স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়। সকল বাঙালীই তাঁহাদের নিকট ঋণী। তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিয়া এই ঋণ স্বীকার করিতেছি। ইতি

১লা বৈশাখ, ১৩৫২ সাল
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

শ্রীসুখময় শর্ম্মা

"যস্যেচ্ছয়ৈব ভুবনানি সমুদ্ভবন্তি
তিষ্ঠন্তি যান্তি চ পুনর্বিলয়ং যুগান্তে।
তস্মৈ সমস্তফলভোগ-নিবন্ধনায়
নিত্যপ্রবুদ্ধমুদিতায় নমঃ শিবায় ॥"

ভারতীয় সকল আস্তিক দর্শনেরই উদ্দেশ্য এক। মানুষ কী উপায়ে দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এই বিষয়ে পথ নির্দেশ করা দর্শনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। দার্শনিকগণ জগতের সমস্ত বস্তুকে তাঁহাদের আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগ শুধু তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য নহে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষেও এক-একটি করিয়া জগতের সকল বস্তু জানা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হইলে, বস্তুপরিচয় অনেকাংশে সহজ হয়। ন্যায়দর্শনের মতে ঐ শ্রেণীর সংখ্যা— ষোল। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহাই ঐ ষোলটির অন্তর্গত। এইপ্রকার শ্রেণীবিভাগের নাম 'পদার্থ-সংকলন'। এক-একটি শ্রেণীর নাম এক-একটি পদার্থ।

জিজ্ঞাসু শিষ্যের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঋষিগণ দর্শন-সূত্রের উপদেশ দিয়াছেন। অধিকারি-বিচারপূর্বক উপদেশ প্রদান ভারতীয় আচার্যগণের রীতি। এই কারণে প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থের প্রথমেই আচার্যগণ অধিকারিনির্দেশ করিয়াছেন।

আরও মনে হয়, সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দর্শনসূত্র রচিত হইয়াছে। ন্যায়সূত্র রচনার কালে নাস্তিকতার প্রসার বেশী ছিল বলিয়া মনে করি। এই কারণে হয়ত যুক্তিপ্রমাণের সাধুতা-নিরূপণে ন্যায়দর্শনে অনেক কথাই বলিতে হইয়াছে। গোতমের ন্যায়দর্শন, বাৎস্যায়নের ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের বার্তিক প্রভৃতিকে অবলম্বন

করিয়া এবং বৈশেষিক দর্শনের সহিত অনেকাংশে যোগ রাখিয়াই নব্যন্যায়ের উদ্ভব। নব্যন্যায় পরিভাষাবহুল, পরিভাষাকে সরল করিয়া প্রকাশ করিতে হইলে একটি শব্দের অর্থ পরিষ্কার করিতে দুই তিন পৃষ্ঠায়ও কুলান কঠিন। এই কারণে শুধু প্রাচীন-ন্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। এই দর্শনকে ন্যায়, তর্কশাস্ত্র, অক্ষপাদদর্শন, আন্বীক্ষিকীবিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

সংশয়-নিরাসপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করার উপায়কে 'ন্যায়' বলে। যুক্তিতর্কের সাহায্যে অপরকে কিছু বুঝাইতে গেলে যে রীতিতে বুঝাইতে হয়, সেই রীতিকেও 'ন্যায়' বলে। গোতমদর্শনে যুক্তিরই প্রাধান্য, ইহাও 'ন্যায়'-সংজ্ঞার কারণ। বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণ করাকেও ন্যায় বলে। এই শাস্ত্রে সেইরূপ প্রণালী বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে, তাহাতেও 'ন্যায়শাস্ত্র' নাম হইতে পারে। প্রতিপক্ষের উদ্ভাবিত তর্কজাল নিপুণতার সহিত তর্কের সাহায্যে খণ্ডিত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্র তর্কপ্রধান, তাই ইহার নাম, তর্কশাস্ত্র। মহর্ষি গোতমের অপর নাম ছিল অক্ষপাদ, এই কারণে তাঁহার দর্শনকে 'অক্ষপাদদর্শন'ও বলা হয়। প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে যে অনুমান করা হয়, তাহার নাম অন্বীক্ষা, অথবা প্রত্যক্ষ কিংবা শ্রুতির সাহায্যে যাহা অবগত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে পরে আলোচনা বা মনন করার নাম অন্বীক্ষা, যে শাস্ত্র ঐ অন্বীক্ষার সহায়তা করে, তাহার নাম আন্বীক্ষিকী। আচার্য উদয়ন কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থে বলিয়াছেন, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে ন্যায়চর্চা ভগবানের মননস্বরূপ।

মূলদর্শনে সাধারণত পাঁচশত সাতচল্লিশটি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি বাচস্পতি মিশ্রের মতে সূত্রসংখ্যা পাঁচ শত আঠাশ। ন্যায়দর্শনে পাঁচটি অধ্যায়, প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি অংশ, এই অংশগুলির

নাম আহ্নিক। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সূত্রগ্রন্থে দশটি আহ্নিক থাকায় অনুমিত হয় যে, মহর্ষি মাত্র দশ দিনে দর্শনখানি রচনা করিয়াছেন।

প্রথম অধ্যা[illegible] আহ্নিকে পদার্থনিরূপণ (ছল পর্যন্ত)।

দ্বিতীয় অ[illegible] আহ্নিকে প্রমাণ-আলোচনা।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয়-আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতিনিরূপণ।

পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে নিগ্রহস্থাননিরূপণ।

প্রসঙ্গত সূত্রমধ্যে অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা করা হইয়াছে। মহর্ষিসম্মত ষোলটি পদার্থের নাম :

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান।

এই ষোলটি পদার্থের যথাযথ জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এইগুলির মধ্যে প্রমেয়পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ-রূপে মুক্তির কারণ, অন্য বস্তুর জ্ঞান তাহাতে প্রয়োজন হয় না। প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তির বেলায় অন্য বস্তুও অপেক্ষিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্ধারণ করাই মুখ্যভাবে হিন্দুদর্শনের উদ্দেশ্য। এই দর্শনেও দেখিতে পাই, প্রথমেই মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মহর্ষি বলিতেছেন, ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ।

মুক্তি বা দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়দর্শন রচিত হইয়াছে।

প্রত্যেকটি পদার্থ-বিষয়ে মহর্ষির মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রমাণ

প্রমাণ ব্যতীত কোনো পদার্থেরই সিদ্ধি হয় না, এই কারণে প্রথমেই প্রমাণ-পদার্থ আলোচিত হইয়াছে। যাহাদ্বারা বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে 'প্রমাণ' বলে। প্রমাণ চারিভাগে বিভক্ত— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চারিপ্রকার প্রমাণের যে কোনও একটির সাহায্য ব্যতীত কোনও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। প্রমাণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান, অপর তিনটি প্রমাণ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে।

প্রত্যক্ষ

আমরা চোখ দিয়া দেখি, কানে শুনি, জিহ্বাদ্বারা খাদ্যবস্তুর রস আস্বাদন করি, নাকদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করি, ত্বক্‌ দিয়া স্পর্শ অনুভব করি, মনের দ্বারা সুখ দুঃখাদির অনুভব করি। এই সকল অনুভব প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতে জন্মে।

চক্ষু, ঘ্রাণ, রসনা, শ্রোত্র, ত্বক্‌ ও মন এই ছয়টির নাম ইন্দ্রিয়। মনে রাখিতে হইবে, চোখ কান প্রভৃতিকে যেরূপে দেখিতেছি, তাহাই ইন্দ্রিয় নহে, এইগুলি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়মাত্র। ইহাদেরই মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাদের নাম ইন্দ্রিয়। মন ব্যতীত অপর পাঁচটিকে বহিরিন্দ্রিয় বলে, মন অন্তরিন্দ্রিয়। কোনও দৃশ্য বস্তুর সহিত যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে, তখনই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। এইরূপে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় আমরা বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়ে কোনো দোষ না থাকে, তবে প্রত্যক্ষও যথার্থই হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে দোষ থাকিলে প্রত্যক্ষ ভুল হইবে। কামলারোগগ্রস্ত ব্যক্তি সাদা রংএর শঙ্খকেও হরিদ্রাভ দেখিয়া

থাকেন। যে বস্তুটি দেখিতেছি বা যে শব্দ শুনিতেছি, তাহার সহিত চোখ বা কানের নিশ্চয়ই একটি সম্বন্ধ ঘটিতেছে এবং এই দৃশ্য বা শ্রব্য বিষয়ের একটি জ্ঞানও জন্মিতেছে। এই সম্বন্ধ এবং জ্ঞান উভয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই জ্ঞান হয়, সুতরাং জ্ঞানকে দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধের ফলরূপে কীর্তন করিয়া থাকেন। আর ঐ জ্ঞান হইতেও একটি ফল উৎপন্ন হয়। যে বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে, তাহা যদি ভালো হয় এবং আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, তবে তাহাকে পাইবার ইচ্ছা হয়, খারাপ হইলে ত্যাগের ইচ্ছা হয়। যদি আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই মনে করি, তবে সেই বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকি। দার্শনিক ভাষায় এই তিনটি ফলের নাম যথাক্রমে— উপাদান, হান ও উপেক্ষা। এই তিনটির যে কোনও একটি প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফল।

দীর্ঘপথ চলিতে চলিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া কোনও দোকানে পাকা আম দেখিলাম, আমের সহিত আমার চক্ষুর সংযোগ ঘটিল। আম প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়, চক্ষু ইন্দ্রিয়, আম ও চক্ষুর সংযোগ—সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ। পরক্ষণেই আম ও আমের আকৃতি স্বাদ প্রভৃতির সাধারণভাবে একটা ধারণা হয়। দার্শনিক পরিভাষায় ঐ সাধারণ জ্ঞানের নাম নির্বিকল্পক জ্ঞান। বিশেষ্যবিশেষণ-ভাবকে 'বিকল্প' বলে। যে প্রত্যক্ষে কোনো পদার্থেরই বিশেষ্যবিশেষণ-ভাব থাকে না, সেই প্রাথমিক প্রত্যক্ষকে 'নির্বিকল্পক' বলে। পরক্ষণে আম ও তাহার স্বাদ প্রভৃতি ধর্মের একসঙ্গে একটি মাখামাখি জ্ঞান উপস্থিত হয়, এই প্রকারে ধর্মের সহিত বস্তুর যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে 'সবিকল্পক' প্রত্যক্ষ বলে। বস্তুর ধর্ম অর্থাৎ আকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকিলে সেই বস্তু সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান হইতে পারে না। যে কোনও বস্তুবিষয়ে জ্ঞান জন্মিবার পূর্বে সেই বস্তুর ধর্ম অর্থাৎ অসাধারণ বিশেষণটির জ্ঞান থাকা

আবশ্যক। জগতের প্রত্যেক বস্তুই স্ব-স্ব অসাধারণ ধর্মের দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হয়। এইভাবে আমটি প্রত্যক্ষ হইলে, "আম খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়", এইরূপ অনুভূতিমূলক সংস্কার উপস্থিত হইবে। যে ব্যক্তি পূর্বে কখনও আম খায় নাই, অথবা অপর কাহাকেও খাইতে দেখে নাই, তাহার পক্ষে আম বস্তুটি কী কাজে লাগে, তাহা জানা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যিনি আম খাইবেন, আমটি একপ্রকার খাদ্য এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, তাহা পূর্বেই তাহার জানা থাকা আবশ্যক। অতঃপর "পূর্বে যে-সকল আম খাইয়াছি, এই আমটিও সেইজাতীয়" এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে আম কিনিতে প্রবৃত্ত হই। ইহারই নাম উপাদান বুদ্ধি, ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের শেষ ফল। সুতরাং এই উপাদান বুদ্ধির করণ বা কারণস্বরূপ যে যথার্থ জ্ঞান, তাহাও প্রমাণ।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শুধু ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আর ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে 'ইহা রস', 'ইহা রূপ' এইভাবের যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল বা প্রমিতি।

বস্তুর লৌকিক প্রত্যক্ষের বেলায় প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের আশ্রয় জীবাত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, এই সংযোগ সকল প্রত্যক্ষের বেলায়ই সাধারণ কারণ। অনেক সময় দেখা যায়, নিকট দিয়া কেহ চলিয়া গেল, অথবা একটা বড়ো শব্দ হইল, কিন্তু আমরা দেখি নাই বা শুনি নাই, সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। তাহার কারণ, মনোযোগের অভাব। আত্মার সহিত সংযুক্ত মন যদি প্রত্যক্ষের জনক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশেষের সহিত যুক্ত হয় এবং সেই যুক্ত ইন্দ্রিয় যদি দৃশ্যাদি বিষয়বিশেষের সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। সমস্ত কারণের মধ্যে বিচ্ছেদহীন যোগ থাকা চাই, কোথাও এই শৃঙ্খলের বিচ্ছেদ ঘটিলে প্রত্যক্ষ হইবে না। প্রত্যক্ষের আরও অনেক কারণ আছে, কিন্তু

দৃশ্যাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকেই প্রধান কারণ বলিতে হয়। প্রত্যক্ষের বেলায় ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ছয় প্রকার— সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায়, বিশেষ্য-বিশেষণভাব বা বিশেষণতা। (এই সম্বন্ধের অপর নাম 'স্বরূপ'।) চক্ষু এবং ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায়মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃপদার্থ, প্রদীপের ন্যায় চক্ষুরও প্রভা আছে। চক্ষুর প্রভা বা রশ্মিপদার্থের সহিত দৃশ্য বস্তুটি সংযুক্ত হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। চক্ষু ব্যতীত অপর বহিরিন্দ্রিয়গুলি বহির্গত হয় না, স্বস্থানে থাকিয়াই তাহারা প্রত্যক্ষের বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদি দ্রব্য, ঘটত্ব, ঘটের রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জন্মে। ঘটের প্রত্যক্ষে সংযোগই সম্বন্ধ। কিন্তু ঘটস্থিত রূপাদির প্রত্যক্ষে 'সংযুক্তসমবায়' এবং রূপাদিগত শুক্লত্বাদির প্রত্যক্ষে 'সংযুক্তসমবেতসমবায়'-নামক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। মনের দ্বারা আমরা আপন-আপন সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহাতেও সংযুক্তসমবায়ই সম্বন্ধ। মন জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই জীবাত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে (নিত্যসম্বন্ধে) সুখ-দুঃখ অবস্থিত। ন্যায়মতে শ্রবণেন্দ্রিয় নিত্যপদার্থ— আকাশস্বরূপ। আকাশেই শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশেই থাকে, আকাশের সহিত শব্দের সম্বন্ধ— 'সমবায়'।

শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ আকাশে অবস্থিত শব্দের প্রত্যক্ষও সমবায়সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। শব্দত্বধর্ম শব্দেই থাকে। ঐ শব্দত্ব, শব্দের তীব্রত্ব, মন্দত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষের বেলায় 'সমবেতসমবায়'-সম্বন্ধই কারণ। কতকগুলি সমবায়রূপ নিত্যসম্বন্ধ এবং কতকগুলি অভাবেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেইস্থলে সম্বন্ধের নাম 'বিশেষণতা'। অভাব-পদার্থ যে কালে যে আশ্রয়ে বর্তমান থাকে, সেইকালে সেই আশ্রয়রূপ বিশেষ্যই অভাবের সম্বন্ধ। উল্লিখিত প্রত্যক্ষগুলি লৌকিক প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ সকলের পক্ষে

সমান। সুতরাং সম্বন্ধও লৌকিক। ন্যায়শাস্ত্রে অলৌকিক প্রত্যক্ষে তিনপ্রকার অলৌকিক সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই।

(১) বহু পদার্থের একই ধর্মের নাম 'সামান্যধর্ম'। সকল মানুষেই মনুষ্যত্বরূপ ধর্ম আছে, সকল গোরুতেই গোত্বরূপ ধর্ম আছে। যে কোনো বস্তুতে তাহার সামান্যধর্মের প্রত্যক্ষ হইলে সেই সামান্যধর্মকেই 'সামান্যলক্ষণ'-সম্বন্ধ বলে। যে কোনো মানুষে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ হইলে সকল মানুষ বিষয়েই মোটামুটি প্রত্যক্ষ জন্মে। তাহা স্বীকার না করিলে মানুষকে দেখিলেই মানুষ বলিয়া কিরূপে চিনিতে পারি। সুতরাং বলিতে হইবে, একজন মানুষকে চিনিবার দিনেই পৃথিবীর সকল মানুষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাই দেখিলেই চিনিতে পারি 'ইনি মানুষ'। সকল মানুষের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের লৌকিক সম্বন্ধ না হইয়াও শুধু মনুষ্যত্বধর্মের পরিচয়ে অলৌকিকভাবে সকল মানুষের পরিচয় একপ্রকার হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যত্বরূপ সামান্যধর্মই 'সামান্য-লক্ষণ'-নামক অলৌকিক সম্বন্ধ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সামান্যধর্ম-বিষয়ক জ্ঞানই সেই সম্বন্ধ।

(২) শঙ্খকে পীত বর্ণের বলিয়া ভ্রম করা, রজ্জুতে সর্পভ্রম করা— প্রভৃতি স্থলে পীতত্ব এবং সর্পত্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় সেই সকল ভ্রমপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদিরূপ লৌকিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেই সকল স্থলে অন্যত্র দৃষ্ট পীতবর্ণ, সর্প প্রভৃতির স্মরণ-মাত্র হইয়া থাকে; এই স্মরণই প্রত্যক্ষের কারণ। স্মরণ জ্ঞানবিশেষ। এই কারণে ইহার নাম— "জ্ঞানলক্ষণ-সম্বন্ধ"।

(৩) যোগিগণ যোগপ্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানবান্। দেশ বা কালের দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয় না। তাঁহারা 'যোগজ'-সম্বন্ধের বলে সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ

করিয়া থাকেন। যিনি সর্বদা সমাধিযুক্ত, তিনি সকল সময়েই সর্ববিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, আর যিনি যুঞ্জান, অর্থাৎ বিযুক্ত যোগী, তিনি ধ্যানস্থ হইয়া যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অতএব যোগজ সন্নিকর্ষ দুই প্রকার— যুক্ত ও যুঞ্জান। ঈশ্বরের সর্ববিষয়েই প্রত্যক্ষজ্ঞান নিত্য, তিনি প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) আশ্রয়। তাঁহার প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন হয় না।

অনুমান

'অনু' শব্দেব অর্থ পশ্চাৎ, আর 'মান' শব্দের অর্থ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ-বিশেষের পরে প্রত্যক্ষজনিত যে যথার্থ জ্ঞান, তাহাই 'অনুমান'-নামক প্রমাণ। আমার আগুনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কোথাও আগুন পাইতেছি না, এমন সময় দূরে কোথাও ধূমের প্রত্যক্ষ হইলে বুঝিতে পারি, সেখানে আগুনও আছে। ধূম দেখিয়া আগুনের অনুমান করি, তারপর সেইস্থানে গেলে আগুন পাওয়াও যায়। উল্লিখিত উদাহরণে ধূমকে বলা হয় হেতু; কারণ ধূমরূপ হেতুর সাহায্যেই আগুনের অস্তিত্ব স্থির করিয়াছি, ধূমই এইস্থলে আগুনের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। যে-বস্তুকে সাধন করিতে যাইতেছি, হেতুর সাহায্যে যাহাকে পাইতে চাই, তাহার নাম 'সাধ্য'। এইস্থলে ধূম দেখিয়া মনে করিতেছি— আগুন আছে। অতএব ধূমরূপ হেতুর সহায়তায় যে আগুনের অস্তিত্ব স্থির করিতে যাইতেছি, সেই আগুনই এইস্থলে 'সাধ্য'। যে স্থানে বা অধিকরণে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয়, তাহার নাম 'পক্ষ'। অনুমানের বেলায় হেতু অপেক্ষা সাধ্য বস্তুটি বেশী জায়গা জুড়িয়া থাকে, অন্তত সমান জায়গায় তো

থাকিবেই, হেতু সকল সময়ই সাধ্য অপেক্ষা অল্প স্থান জুড়িয়া থাকে, যদি কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ সাধ্য অপেক্ষা হেতু বেশী জায়গায় থাকে, তখন সেই হেতুর সাহায্যে যে অনুমান করা হয়, তাহা ভুল। যথা, আগুনরূপ হেতুর দ্বারা ধূমরূপ সাধ্যের অনুমান। ভুল অনুমান হইতে যে অনুমিতি হইবে, তাহার যথার্থতা আশা করা যাইতে পারে না। বেশীস্থানে অবস্থিতির নাম ব্যাপকতা, আর অল্পস্থানে অবস্থিতির নাম ব্যাপ্যতা। অর্থাৎ হেতু ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক। হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবরূপ যে সাধারণ সম্বন্ধ আছে, তাহার জ্ঞান থাকা চাই। যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থানে আগুনও থাকে, এই প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকিলে অনুমান হইতে পারে না। অতএব দেখা গেল, অনুমানের বেলায় প্রথমত হেতুটির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই, তারপর হেতু ও সাধ্যের মধ্যে উল্লিখিত ব্যাপ্যব্যাপক-সম্বন্ধ আছে, এই জ্ঞান থাকা চাই। সাধ্যের ব্যাপ্তিযুক্ত হেতুটি সাধ্যের অধিকরণে আছে, এই জ্ঞানও থাকা চাই। হেতু-প্রত্যক্ষের পরেই ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্তিস্মরণ হইয়া থাকে, এই প্রকার হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতেই অনুমান হয়। হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ পূর্বে কোথাও প্রত্যক্ষ না হইলে সেই হেতু দ্বারা অনুমান হয় না। যে ব্যক্তি পাকঘরে বা অন্য কোথাও ধূম ও আগুনের সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পরে কোথাও ধূম দেখিলে ধূম ও আগুনের সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির স্মরণ করিতে পারে। যে ব্যক্তি কখনও উভয়ের সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার পক্ষে কিরূপে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের স্মরণ হইবে। অনুমানের মূলে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ থাকা চাই। ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ চারি রকমের : (১) যে যে স্থানে ধূম আছে সেই সেই স্থানে আগুন আছে, এই প্রকার ভাবমুখে সম্বন্ধের নাম অন্বয়ব্যাপ্তি। (২) যেখানে আগুন নাই, সেখানে ধূম নাই, এইরূপ অভাবমুখেও সম্বন্ধ স্থির করা যায়। এই প্রকার সম্বন্ধের নাম

ব্যতিরেকব্যাপ্তি। ধূমরূপ হেতু দ্বারা আগুনরূপ সাধ্যের অনুমান করিতে উভয়বিধ সম্বন্ধকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কোনো কোনো স্থলে অভাবমুখে সম্বন্ধ ধরা যায় না, সেই সব স্থলে কেবল ভাবসম্বন্ধ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, যে যে বস্তু জ্ঞানের বিষয়, সেই সেই বস্তু বাক্যেরও বিষয়। এইস্থলে অভাবমুখে সম্বন্ধ গ্রহণ করা চলে না। কারণ 'যে যে বস্তু বাক্যের বিষয় নয়'— এরূপ বলা যায় না। জগতের সকল বস্তুই বাক্যের বিষয়। (৩) এই প্রকার শুধু ভাবমুখে সম্বন্ধের নাম— কেবলান্বয়ী।

কোনো কোনো স্থলে ভাবমুখে সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সেই সকল অনুমানে শুধু অভাবমুখে সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির ধারণা করিতে হয়। যেমন, যাহা পৃথিবী নয়, তাহা গন্ধযুক্ত নয়। (৪) এই সম্বন্ধের নাম কেবলব্যতিরেকী।

মহর্ষি গোতম অনুমানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) কারণ হইতে কার্যের অনুমান, (২) কার্য হইতে কারণের অনুমান, (৩) এই দুইপ্রকার ভিন্ন অন্য অনুমান। ইহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা যথাক্রমে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করা হয়, ইহা কারণহেতুক কার্যের অনুমান। গভীর রাত্রিতে প্রবল বর্ষণ হইয়াছে, আমরা নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই বুঝি নাই। পরদিন প্রাতঃকালে খাল নালা নদী প্রভৃতির পূর্ণতা দেখিয়া জলবৃদ্ধিরূপ কার্যের মূলে নিশ্চয়ই বর্ষণরূপ কারণ ঘটিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া থাকি। ইহা কার্যহেতুক কারণের অনুমান। কোনো বস্তু দেখিলেই বুঝিতে পারি, দর্শন-ক্রিয়ার নির্বাহক একটি ইন্দ্রিয় আছে, কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, প্রথমত এইভাবে একটি জ্ঞান জন্মে, অতএব দর্শনরূপ কার্যের মূলেও কারণ আছে। এই প্রকার অনুমানের সংজ্ঞা সামান্যতোদৃষ্ট; সাধারণভাবে সম্বন্ধজ্ঞানের ফলে

এই অনুমান হয় বলিয়া ইহার নাম সামান্যতোদৃষ্ট। অনুমানকে আচার্যগণ আরও দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, স্বার্থ ও পরার্থ।

শুধু নিজের সন্দেহ নিরাসের উদ্দেশ্যে আমরা মনে মনে যে অনুমান করিয়া থাকি, তাহাই স্বার্থানুমান, আর পরকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে যে অনুমান প্রযুক্ত হয়, তাহাই পরার্থানুমান।

নিজে যেমন-তেমন করিয়া বুঝিতে পারি, কিন্তু অপরকে বুঝাইতে হইলে বিষয়বস্তু আরও পরিষ্কার করিতে হয়। শুধু হেতুর সাহায্যে অন্যকে বিশ্বাস করানো যায় না, আরও কয়েকটি উপকরণের প্রয়োজন হয়। আচার্যগণ সেই সকল উপকরণকে 'অবয়ব' নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবয়ব পাঁচটি— প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

দুই বন্ধু সন্ধ্যাকালে পাহাড়ের নিকটে ভ্রমণ করিতেছেন; পাহাড়ে আগুন আছে কি না, এই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিতর্ক চলিল। একজন বলিলেন, এই পাহাড়ে নিশ্চয়ই আগুন আছে। (প্রতিজ্ঞা)

আগুনের অস্তিত্ব স্থির করিতে উপযুক্ত কারণ দেখানো দরকার। তাই বলিলেন— ঐ দেখো, পাহাড়ে ধূম দেখা যাইতেছে। (হেতু)

কেবল ধূম দেখিয়াই অপর বন্ধু বিশ্বাস করিতেছেন না, সুতরাং দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝানো প্রয়োজন, এই কারণে বলিলেন— পাকঘরে যখন ধূম দেখা যায়, তখন সেখানে আগুনও থাকে, তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। (উদাহরণ)

এই পাহাড়েও ধূম দেখিতেছি। (উপনয়)

অতএব এই পাহাড়েও আগুন আছে। (নিগমন)

এই পাঁচটি অবয়বের প্রয়োগে অনুমানের সত্যতায় আর সন্দেহ রহিল না। অনুমান যদিও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল, কেবল নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না, তথাপি তাহার কার্যক্ষেত্র প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র

অপেক্ষা ব্যাপক। প্রত্যক্ষ শুধু বর্তমান বিষয়েই সীমাবদ্ধ, কিন্তু অনুমান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— এই তিনকালের বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে।

নদীর বৃদ্ধি দেখিয়া অতীত বর্ষণের, ধূম দেখিয়া বর্তমান আগুনের এবং আকাশে কালো মেঘ দেখিয়া ভবিষ্যৎ বর্ষণের অনুমান করা যায়। যে সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির জ্ঞানকে অনুমান বলা হয়, তাহাতে যদি কোনো ভুল না থাকে, আর যে হেতুর প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই হেতুটি এবং প্রত্যক্ষ যদি নির্দোষ হয়, তবে অনুমানও অবশ্যই নির্দোষ হইবে। নির্দোষ অনুমানের ফলরূপ যে অনুমিতি হয়, তাহাতে কোনো দোষ থাকিতে পারে না। হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধে অর্থাৎ ব্যাপ্তিতে এবং গৃহীত হেতুতে কোনো দোষ আছে কিনা, তাহা বিশেষরূপ বিবেচনা করিতে হয়। এই বিষয়ে ন্যায়শাস্ত্রে কতকগুলি উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। হেতুটি নির্দোষ কিনা, বিচার করিতে হইলে প্রধানত তিনটি বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) যে অধিকরণে সাধ্য আছে কিনা বিচার করিতেছি, সেই অধিকরণে হেতুর নিশ্চিত অবস্থিতি। (২) পূর্বে যে অধিকরণে সাধ্যকে দেখিয়াছি, সেখানে হেতুর নিশ্চিত অবস্থিতি। (৩) যে অধিকরণে কখনও সাধ্য থাকিতে পারে না, সেই অধিকরণে হেতুর অনবস্থিতি।

এই ত্রিবিধ পরীক্ষায় হেতুর নির্দোষিতা স্থির না হইলে সেই হেতুর সহায়তায় সাধ্যবস্তুর অবস্থিতি বিষয়ে নির্ভুল অনুমিতি হইতে পারে না। নৈয়ায়িক আচার্যগণ দোষযুক্ত হেতুকে 'হেত্বাভাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে হেতু বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক যাহা হেতু নহে, তাহাই হেত্বাভাস।

হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ ও কালাত্যয়াপদিষ্ট।

(১) সাধ্যের অধিকরণে হেতু থাকা উচিত। সাধ্যকে নির্ণয় করিতে যাইয়া যে হেতুর উপর নির্ভর করিতেছি, সেই হেতুটি যদি সাধ্যের অধিকরণে থাকে এবং যেখানে কখনও সাধ্য থাকে না, তেমন জায়গায়ও থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, সেই হেতু নির্দোষ নহে। যদি বলি— পাহাড়ে ধূম আছে, যেহেতু আগুন দেখিতেছি। তখন বুঝিতে হইবে, আগুনরূপ হেতুর দ্বারা পাহাড়রূপ পক্ষে বা অধিকরণে ধূমরূপ সাধ্যের অনুমান করিতেছি। এখানে হেতুটি দোষযুক্ত। কারণ ধূম যেখানে কখনও থাকে না, তেমন জায়গায়ও আগুনকে দেখা যায়, যথা, তপ্ত লৌহপিণ্ড। এই দোষটির নাম সব্যভিচার বা অনৈকান্ত। হেতুটি সাধ্যের অধিকরণ ছাড়াও বেশী জায়গায় আছে, এই কারণে ঐ হেতু ব্যভিচারী বা অনৈকান্ত।

(২) যে সাধ্যবস্তুর অস্তিত্ব সাধন করিতে যাইতেছি, হেতুটি যদি তাহা সাধন করিতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, এমন কি, সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ হয়, তখন বুঝিতে হইবে, হেতুতে দোষ আছে। একটি ঘোড়া দেখিয়া যদি বলা হয়, এই প্রাণীটি গোরু, যেহেতু ঘোড়ার আকৃতি প্রভৃতি ইহাতে আছে, তখন বুঝিতে হইবে, প্রাণীটিতে গোত্বরূপ ধর্মের সাধন করিতে যাইতেছি, অথচ অশ্বত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছি। গোত্ব-ধর্মের অধিকরণে (গোরুতে) কখনও অশ্বত্ব থাকে না, গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। এই হেত্বাভাসের নাম বিরুদ্ধ। বৈশেষিকমতে বিরুদ্ধকেই 'অসন্' শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে।

(৩) অনুমানের সাহায্যে কাহাকেও কিছু বুঝাইতে গেলে সাধ্যবস্তু, তাহার অধিকরণ এবং হেতু, এই তিনেরই প্রসিদ্ধি থাকা চাই। কল্পিত অলীক বস্তু বিষয়ে কখনও অনুমান হয় না। যদি বলা হয়— ছায়া একপ্রকার দ্রব্য, যেহেতু তাহাতে কালো-রং প্রভৃতি গুণ দেখিতেছি (গুণপদার্থ শুধু দ্রব্যেই থাকে।) তখন, বুঝিতে হইবে, কালো-রংকে হেতু-

রূপে গ্রহণ করিয়া ছায়াতে দ্রব্যত্বের সাধন করা হইতেছে। এখানে প্রশ্ন উঠিবে, ছায়াতে কালো রং আছে, ইহা কি সর্ববাদিসম্মত। নৈয়ায়িক আচার্যগণ তো তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং অপর কোনও হেতুর সাহায্যে পূর্বে এই হেতুটির দৃঢ়তা সাধন করিতে হয়। অতএব এই স্থলে হেতু নির্দোষ নহে, হেতুটিও সাধ্যের ন্যায় সাধনীয়। এই কারণে এই হেত্বাভাসের নাম 'সাধ্যসম' বা 'অসিদ্ধ'। অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার, আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি।

কেহ বলিলেন, "সোনার পাহাড়ে আগুন আছে, যেহেতু ধূম দেখিতেছি"। এই উক্তিতে আশ্রয়াসিদ্ধি হেত্বাভাস। কারণ, সাধ্য আগুনের অধিকরণরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই বস্তু (সোনার পাহাড়) অপ্রসিদ্ধ, কেহ কখনও সোনার পাহাড় দেখেন নাই, শোনেনও নাই।

কেহ যদি বলেন, পুকুর দ্রব্যবিশেষ, যেহেতু তাহাতে ধূম আছে, তখন বুঝিতে হইবে, তিনি ধূমরূপ হেতুর সাহায্যে পুকুররূপ পক্ষে বা অধিকরণে দ্রব্যত্বের সাধন করিতে চান। এই স্থলে দেখিতেছি, হেতুটি (ধূম) কখনও সাধ্যের (দ্রব্যত্বের) অধিকরণরূপে গৃহীত পুকুরে থাকে না; সুতরাং অনুমান নির্দোষ নহে। এই দোষের নাম 'স্বরূপাসিদ্ধি।'

যদি কেহ বলেন, "পাহাড়ে আগুন আছে, যেহেতু নীল ধূম দেখিতেছি"; তখন আমরা বুঝিতে পারি, এই ব্যক্তি নীলধূম-রূপ হেতুর সাহায্যে পাহাড়রূপ পক্ষে আগুনরূপ সাধ্যের অনুমান করিতে চান। এখানে কেবল ধূমকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলেই চলিত। নীল-রূপ অতিরিক্ত একটি বিশেষণ সংযোজন করিয়া ধূমকে বিশেষ করিবার কোনো সার্থকতা নাই; বিশেষত শুধু ধূম ও আগুনের মধ্যেই ব্যাপ্তি বা সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছে, নীলধূমরূপে ধূমকে জানা হয় নাই, সেরূপ

ব্যাপ্তিও গৃহীত হয় নাই। অতএব এই হেতুটি নির্দোষ নহে, এই হেত্বাভাসের নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি।

(৪) একজন বলিতেছেন, "পর্বতে আগুন আছে, যেহেতু ধূম দেখিতেছি"; অপর ব্যক্তি বলিতেছেন, "পর্বতে আগুন নাই, যেহেতু জল দেখিতেছি"; যদিও এরূপস্থলে উভয়ের হেতুতেই কোনো দোষ নাই, তথাপি একই সময়ে এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি হেতুর বিষয় শুনিলে মধ্যস্থ শ্রোতার সাধ্য-বিষয়ে স্থিরভাবে জ্ঞান হইতে পারে না। সাধ্য এবং সাধ্যের অভাব উভয়ের সাধক দুইটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, উভয় হেতুর মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায় না। এই হেত্বাভাসের নাম 'সৎপ্রতিপক্ষ'। যে হেতুর প্রতিপক্ষ (সমানবল বিরোধী হেতু) সৎ (বিদ্যমান) থাকে, তাহার নাম সৎপ্রতিপক্ষ। ইহার অপর নাম 'প্রকরণসম'। উভয় হেতুর কোন্ হেতু প্রকৃষ্ট বা নির্দোষ, সেই বিষয়ে চিন্তা হয়, এই কারণে উভয় হেতুই 'প্র-করণ-সম।'

(৫) যে-হেতু অনুমানের কাল ব্যতীত অন্য কালে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'কালাত্যয়াপদিষ্ট', 'কালাতীত' বা 'বাধ' নামক হেত্বাভাস বলে। অথবা কোনো বলবৎ প্রমাণের দ্বারা পক্ষে যদি অনুমেয় ধর্মের বাধ স্থিরীকৃত হয়, তবে সেই স্থলে প্রযুক্ত হেতুকে কালাত্যয়াপদিষ্ট বলে। যথা, বহ্নির উষ্ণতা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। কোনো হেতুর সাহায্যেই অনুষ্ণতার অনুমিতি হইবে না। কারণ অনুষ্ণত্বরূপ অনুমেয় বা সাধ্যের যে ধর্ম, তাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণরূপ বহ্নিতে কোনো কালেই থাকে না, পক্ষে অনুষ্ণত্বের অভাব আছে, এই জ্ঞান সকল সময় থাকায় এই বিষয়ে সংশয় ও অনুমিতির কালই নাই। যে-ক্ষণে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ঠিক সেই-ক্ষণেই তাহাতে রূপ রস প্রভৃতি কোনো গুণ থাকে না, ইহা নৈয়ায়িকসিদ্ধান্ত। কেহ যদি অনুমান করেন যে, উৎপত্তির ক্ষণে ঘটে গন্ধ আছে, যেহেতু ঘট

পার্থিব দ্রব্য; তখন আমরা বুঝিব, পার্থিব দ্রব্যত্বরূপ হেতুর সাহায্যে উৎপত্তিক্ষণে ঘটে গন্ধের সাধন করা হইতেছে। কিন্তু বস্তুত উৎপত্তি-ক্ষণে ঘটে গন্ধ না থাকায় এই হেতু দোষযুক্ত।

প্রাগুক্ত পাঁচটি দোষের যে কোনো একটি দোষ থাকিলেই অনুমানকে অসৎ বলা হয়। সেই অনুমানের দ্বারা নির্ভুল অনুমিতি হইতে পারে না। অনুমানে হেতুই সর্বাপেক্ষা প্রধান, কারণ হেতুর উপরই প্রায় সব নির্ভর করে, এই কারণে এই সকল দোষে হেতুকেই দুষ্ট বলা হয়। হেতুতে দোষ আছে কি না, এই বিচার করিবার আরও একটি উপায় আছে। যদি অনুসন্ধানে এরূপ কোনো বস্তু পাওয়া যায়, যাহা হেতুর অধিকরণ অপেক্ষা কম জায়গায় থাকে, কিন্তু সাধ্যবস্তুর অধিকরণ অপেক্ষা বেশী জায়গায় বা সাধ্যবস্তুর সমান জায়গায় থাকে, তখন বুঝিতে হইবে হেতুতে দোষ আছে, হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য হয় নাই। সুতরাং সেরূপ স্থলে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধই নাই। এই দোষের সংজ্ঞা 'উপাধি'।

মনে করুন, পাহাড়ে আগুন দেখিয়া আগুনরূপ হেতুর সাহায্যে কেহ ধূমরূপ সাধ্যের অনুমান করিতে যাইতেছেন। তাঁহার অনুমানের যথার্থতা বিচার করিতে যদি আমরা উপাধির অনুসন্ধান করি, তবে দেখিব, ভিজা-কাঠের সংযোগ উপাধি হইতে পারে। যে যে জায়গায় ধূম দেখা যায়, সেই সেই জায়গায় ভিজা দাহ্যবস্তুর যোগ থাকে; কিন্তু যে যে জায়গায় আগুন দেখা যায়, সেই সেই জায়গায় সর্বত্র ঐ যোগ থাকে না। জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডে আগুন দেখি, কিন্তু সেখানে কোনো ভিজা দাহ্যবস্তুর সংযোগ নাই। অতএব বুঝিতে হইবে, সাধ্যরূপ ধূম অপেক্ষা হেতুরূপ আগুন বেশী জায়গায় আছে। সাধ্য ও হেতুর মধ্যে সাধ্য ব্যাপক, আর হেতু ব্যাপ্য হওয়া চাই, কিন্তু এইস্থলে সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং অনুমানে দোষ আছে, হেতুটি ব্যভিচারী বা অনৈকান্তিক। এইরূপ অনুমানের দ্বারা নির্ভুল প্রমিতি হয় না।

উপমান

দুইটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে দুইএর মধ্যে পরিচিত বস্তুর সাহায্যে অপরিচিত বস্তুটিকে চিনিতে পারা যায়। সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে কোনো বস্তুর পরিচয়রূপ যে অনুভূতি, তাহার নাম উপমিতি। উপমিতির করণ বা হেতুস্থানীয় যে সাদৃশ্যজ্ঞান তাহাকেই উপমান বলে। মনে করুন, এক ব্যক্তি কখনও গবয়-পশু (নীলগাই) দেখেন নাই, যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার মুখে জানিলেন নীলগাই দেখিতে গোরুর মতো। একদিন বনের ভিতর গোরুর মতো একটি প্রাণী দেখিলেন, দেখিবামাত্র সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা স্মরণ হইল, তারপর দৃষ্ট প্রাণীটিকে নীলগাই বলিয়া স্থির করিলেন। এইরূপে পরিচিত কোনো বস্তুর সাহায্যে তাহার সাদৃশ্যবিশিষ্ট অপর কিছুকে জানিতে পারাই উপমান-প্রমাণের ফল বা উপমিতিরূপ প্রমিতি।

বৃক্ষ লতা পাতা ওষধি প্রভৃতি অনেক বস্তুর জ্ঞানই উপমানপ্রমাণের সাহায্যে হইয়া থাকে। কোনো কোনো আচার্যের অভিমত এই যে, দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে যেমন উপমিতি হয়, ঠিক সেইরূপ বৈসাদৃশ্য থাকিলেও হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখনও উট দেখেন নাই, কিন্তু তিনি অভিজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছেন, উট অতি বিশ্রী, কদাকার পশু, তাহার ঘাড় খুব লম্বা, পিঠ খুব উঁচু ইত্যাদি। এই কথাগুলির দ্বারা অন্য পশুর সহিত উটের কোনোপ্রকার সাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝা গেল না, পরন্তু অপর পশুর সহিত ইহার বিশেষ বৈসাদৃশ্য আছে, তাহাই সূচিত হইল। যদি কোথাও সেই ব্যক্তি এইপ্রকার একটি পশু দেখেন, তখন লম্বা ঘাড়, উচ্চ পিঠ প্রভৃতি দেখিয়াই পশুটিকে উট বলিয়া স্থির করিতে পারিবেন। এইপ্রকার উপমিতির নাম বৈধর্ম্যোপমিতি।

শব্দ

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান-প্রমাণের দ্বারা যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না, সেই বিষয়ে শব্দ-প্রমাণকেই অবলম্বন করিতে হয়। শব্দের প্রকৃত অর্থবিষয়ে যাঁহার জ্ঞান আছে, পরকে মিথ্যা প্রতারণা করিবার কোনো অভিসন্ধি যাঁহার নাই, তিনি যদি অন্যকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শব্দ প্রয়োগ করেন, তবে সেই শব্দকেই প্রমাণ বলা যাইতে পারে, আর সেই শব্দ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে 'আপ্ত' বলা যায়। ঋষি, আর্য, ম্লেচ্ছ সকলই আপ্ত হইতে পারেন। জগতে যত শব্দ আছে, প্রত্যেকেরই একটি-না-একটি অর্থও আছে, কোনো শব্দই নিরর্থক নহে। প্রত্যেক শব্দে যে অর্থবোধক শক্তি নিহিত আছে, নৈয়ায়িক-মতে সেই শক্তি ঈশ্বরীয় ইচ্ছামাত্র। আপ্তবাক্য দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থরূপে দুইপ্রকার। যে আপ্তবাক্যের অর্থ ইহলোকেও প্রত্যক্ষ বা অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, তাহাই দৃষ্টার্থ, আর যে আপ্তবাক্যের অর্থ ইহলোকে অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না, তাহাই অদৃষ্টার্থ। "স্বর্গকাম ব্যক্তি অশ্বমেধ-যাগ করিবেন" এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। কিন্তু একমাত্র এই শ্রুতি ব্যতীত আর ইহলোকে অন্য কোনো প্রমাণের সাহায্যে অশ্বমেধ-যজ্ঞ যে স্বর্গের সাধন, তাহা জানা যায় না। অতএব বেদাদি-শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যই অদৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ।

কোন্ শব্দের কিরূপ অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহা লোকব্যবহার, ব্যাকরণশাস্ত্র, অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে জানিতে হয়। শৈশবে প্রথম যখন শব্দের অর্থ শিখিতে আরম্ভ করি, তখন লোকব্যবহারকেই গ্রহণ করি। মনে করুন, কোনো বৃদ্ধব্যক্তি একজন যুবককে আদেশ করিলেন, "গোরুটিকে আনো"। নিকটে একটি শিশু দাঁড়াইয়া আছে—যে উল্লিখিত শব্দ দুইটির অর্থ কিছুই জানে না, বৃদ্ধের উচ্চরিত বাক্য

শুনিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। যুবক গোরুটিকে আনিলে শিশু তাহার 'গোরুর আনয়নরূপ কাজ' দেখিল। বৃদ্ধ যুবককে পুনরায় আদেশ করিলেন, "গোরুটিকে বাঁধিয়া রাখো, ঘোড়াটিকে আনো।" যুবকও তাহাই করিল। শিশু এইবার মনে মনে বিচার করিতে লাগিল "গোরুটিকে আনো" শব্দটির যোগ থাকিলে এই প্রাণীটিকে লইয়া আসা হয়, আর 'গোরু' শব্দটি ঠিক রাখিয়া 'আনো' না বলিয়া "বাঁধিয়া রাখো" বলিলে ঐ প্রাণীটিকেই বাঁধিয়া রাখা হয়। অতএব এই প্রাণীটির নাম 'গোরু'। এইরূপে 'আনো', 'বাঁধিয়া রাখো', 'ঘোড়া' প্রভৃতি শব্দেরও অর্থজ্ঞান হয়। শিশুকালে সকলেরই এইভাবে শব্দার্থ-জ্ঞান হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসকল বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিবার শক্তি জন্মে বটে, কিন্তু শৈশবেও কিঞ্চিৎ বিচারশক্তি না থাকিলে কিছুই জানিতে পারিতাম না।

বর্ণিত চারিটি প্রমাণের কম বা বেশীসংখ্যক প্রমাণ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই।

বেদের সম্বন্ধে ন্যায়ের কিরূপ অভিমত, তাহাও এই প্রসঙ্গেই আলোচিত হইতেছে। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানের আশ্রয় এবং দয়াময়। জগৎ সৃষ্টি করিয়া মানবসমাজের হিতার্থে তিনি প্রথমে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল উপদেশবাক্যের সমষ্টিই বেদ-নামে অভিহিত। শাস্ত্রের বিষাদিনাশক বহু মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রেরও উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান্, তিনিই জীবের কল্যাণার্থে বেদের উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। তিনি তত্ত্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ, এই কারণে তিনিও আপ্ত এবং প্রমাণ। তাঁহার প্রামাণ্য দ্বারাই তদুপদিষ্ট বেদেরও প্রামাণ্য, উদাহরণস্বরূপ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য বা সত্যার্থতাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরমেশ্বর কোনো প্রমাজ্ঞানের করণরূপে প্রত্যক্ষাদির ন্যায় প্রমাণ নহেন, কিন্তু প্রমাতৃরূপে তিনিও প্রমাণ, প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ সর্ববিষয়ে যথার্থ জ্ঞানবত্তাই তাঁহার প্রামাণ্য।

প্রমেয়

প্রমাণের পরেই 'প্রমেয়'-পদার্থের নিরূপণ করা হইয়াছে। প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়পদার্থকেই জানিতে হয়। প্রকৃষ্ট মেয়, অর্থাৎ জ্ঞেয়, ইহাই প্রমেয় শব্দের অর্থ। প্রমেয়ের জ্ঞান মুক্তির অনুকূল, প্রমাণসিদ্ধ সকল বস্তুই প্রমেয় বটে, কিন্তু ন্যায়দর্শনে আত্মা প্রভৃতি বারটি পদার্থকে প্রমেয় সংজ্ঞায় প্রকাশ করা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, এই বারটি পদার্থ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মের হেতু, এই পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান হইলে সেই মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়, এইকারণে মাত্র বারটি পদার্থকে প্রমেয়-বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গ এই বারটি পদার্থ প্রমেয়-নামে অভিহিত।

(১) আত্মা শব্দে এখানে জীবাত্মাকে বুঝাইতেছে। আত্মা নিত্য, তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার সংযোগ আছে, সুতরাং জীব অসংখ্য। শরীরের সহিত আত্মার বিশেষ একপ্রকার সম্বন্ধ আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন জীবাত্মার মানস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। "আমি জানি", "আমি করি" ইত্যাদি অনুভবে আমি-রূপে যাঁহার জ্ঞান হয়, তিনিই আত্মা। নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই, "আমি আছি" এইপ্রকার অনুভব সকল প্রাণীরই হইয়া থাকে। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের দ্বারা পরদেহস্থিত আত্মার অস্তিত্বের অনুমানও করা যায়। আপন-আপন দেহস্থিত আত্মা মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও পরদেহে আত্মার সত্তা সম্পূর্ণভাবে অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

দূর হইতে গাড়িকে আসিতে দেখিলে বুঝিতে পারি, নিশ্চয়ই তাহার চালক কেহ আছে, অন্যথা অচেতন গাড়ির চলা সম্ভবপর হইত না। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কেও আত্মা বলা যায় না। কারণ, চোখ দিয়া কোনো বস্তু দেখিয়া যখন পুনরায় জিহ্বা দ্বারা তাহার স্বাদ গ্রহণ করি, তখন বলিয়া থাকি "আমি পূর্বে দেখিয়াছিলাম, এখন সেই বস্তুটির স্বাদ গ্রহণ করিতেছি।" যদি চোখ এবং রসনাই দেখা ও আস্বাদগ্রহণের কর্তা হইত, তবে "আমি দেখিয়াছিলাম", "আমিই স্বাদগ্রহণ করিতেছি" এইপ্রকার অনুভব হইতে পারিত কি। অতএব বুঝিতে হইবে, আত্মা ও ইন্দ্রিয় এক নহে।

শরীরকেও আত্মা বলা যায় না, কারণ মৃত-শরীরে চৈতন্য থাকে না। মৃত শরীরও শরীর বটে, কিন্তু তাহাতে চৈতন্য তো থাকিতে পারে না। প্রত্যেক প্রাণীই আপন-আপন কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহা আচার্যদের সিদ্ধান্ত। যদি শরীরই ভালো কাজ এবং খারাপ কাজের কর্তা হয়, তবে শরীরের নাশ হইলে (মৃত্যুর পরে) কে পূর্বকৃত কাজের ফলভোগ করিবে। সুতরাং শরীর ভিন্ন অন্য কোনো পদার্থকে আত্মা বলিতে হইবে।

মনকেও আত্মা বলা যায় না। কারণ মনের সংযোগ হইলেই আত্মাতে বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, ইহা সিদ্ধান্ত। সুতরাং জ্ঞাতৃরূপ আত্মা ও জ্ঞানের সাধনরূপ মনের মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। বিশেষত মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ (অণুপরিমাণযুক্ত)। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মাতে থাকে। যদি মনকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনেই আছে। কিন্তু সুখ-দুঃখাদি মনের ধর্ম হইলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, অণুপরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুতে যাহা থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব মন এবং আত্মা পৃথক পদার্থ।

(২) যাহার সহিত বিশেষ একটি সম্বন্ধ না থাকিলে আত্মার সুখদুঃখ প্রভৃতি ভোগ হয় না, তাহারই নাম শরীর। অথবা আত্মার প্রযত্ন হইতে যে ক্রিয়া বা চেষ্টা উৎপন্ন হয়, সেই চেষ্টার আশ্রয়ই শরীর। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ও শরীরকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, শরীরের নাশে ইন্দ্রিয়েরও নাশ অবশ্যম্ভাবী। সকল জীবাত্মাই আপন-আপন শরীরে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। শরীর সুখ-দুঃখভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান।

আমাদের শরীর পাঞ্চভৌতিক, তাহাতে পৃথিবীর অংশ বেশী, এইকারণে মর্ত্যলোকের সকল শরীরই পার্থিব।

(৩) ইন্দ্রিয়— প্রমেয়বর্গে তৃতীয় স্থানীয়। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়, মন অন্তরিন্দ্রিয়। ন্যায়মতে হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় নাই। প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের কারণকেই নৈয়ায়িকগণ 'ইন্দ্রিয়' সংজ্ঞা দিয়াছেন। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু ও ত্বক্ এই চারিটি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশস্বরূপ, অতএব নিত্য। মন নির্বিকার এবং আমরণ-স্থায়ী, জীবের শরীরেই মনের অবস্থান। সুখ-দুঃখাদির অনুভূতির বেলায় মন অতি নিকটবর্তী কারণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোনও একটি ইন্দ্রিয় গৌণ কারণ। দেখা, শোনা প্রভৃতির সহযোগেই সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়। মনোহর দৃশ্য দেখিলে বা উৎকৃষ্ট সংগীত শুনিলে সুখী হই, বিপরীত দৃশ্যাদিতে দুঃখ পাই, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। ইন্দ্রিয়কে চোখে দেখা যায় না বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয় বলিয়া যেগুলিকে মনে করি, ঐগুলি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়মাত্র। আশ্রয়ই যদি ইন্দ্রিয় হইত, তবে তদপেক্ষা বড়ো বা ছোটো বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে পারিত না। অতি ক্ষীণ আলোক যেমন কোনো বড়ো বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে

পারে না, সেইরূপ ক্ষুদ্র অধিকরণে অবস্থিত ক্ষুদ্রতর আধেয় কোনও বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয় তাহাদের আশ্রয় হইতে পৃথক্ বস্তু এবং আমাদের প্রত্যক্ষের বাহিরে।

(৪) ইন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে তাহার নাম 'অর্থ'। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রহণের বিষয় বা অর্থ 'গন্ধ'। রসনেন্দ্রিয় রস (স্বাদ) গ্রহণ করে, অতএব রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বা অর্থ 'রস'। চক্ষুর অর্থ রূপ, ত্বকের স্পর্শ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ। পার্থিবদ্রব্য, জল, বায়ু, তেজ প্রভৃতি বস্তুবিষয়েও ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হইয়া থাকে, এইকারণে ঐগুলিও ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা অর্থ বটে, কিন্তু এইগুলির যথার্থজ্ঞান মুক্তির কারণ নয় বলিয়া কোনো কোনো আচার্যের মতে ইহারা অর্থই নহে। গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ পৃথিবীতে থাকে। রস, রূপ ও স্পর্শ জলে থাকে। রূপ ও স্পর্শ তেজে থাকে। স্পর্শ বায়ুতে থাকে এবং শব্দ আকাশে থাকে। যে ইন্দ্রিয়ে যে গুণের উৎকর্ষ থাকে, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা শুধু সেই গুণেরই প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব বস্তু, তাহাতে গন্ধাদি চারিটি গুণই আছে বটে, কিন্তু গন্ধের উৎকর্ষ থাকায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয়। রসনেন্দ্রিয় যদিও জলীয় বস্তু, রস রূপ ও স্পর্শের আশ্রয়; তথাপি রসের উৎকর্ষ থাকায় তদ্দ্বারা শুধু রসেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপে অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

(৫) জীবের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের নামই 'বুদ্ধি'। দৃশ্য শ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, পরে নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধির আশ্রয় জীব। মন যদি বুদ্ধির আশ্রয় হইত, তবে বুদ্ধির প্রত্যক্ষই হইত না, যেহেতু মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। কোনো বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলে "আমি ইহা জানিতেছি" এইরূপে জীবই সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। জ্ঞান, বুদ্ধি, উপলব্ধি প্রভৃতি একই পদার্থ,

শব্দভেদ মাত্র। বুদ্ধি দুইপ্রকার— অনুভূতি ও স্মৃতি। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান বা প্রমিতি উৎপন্ন হয়, তাহাই অনুভূতি, অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে প্রথম যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুভূতি। অনুভূত বিষয়ে পরে অনুভব হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম স্মৃতি। মনে করুন, একজন একটি হাতি দেখিলেন, এই প্রাথমিক দেখাই হাতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি। কিছুদিন পরে পূর্বের দেখা হাতিটি যে পথে গিয়াছিল সেই পথ দেখিয়া, অথবা সেই হাতির ন্যায় অন্য একটি হাতি দেখিয়া অথবা যে কোনো কারণে পূর্বের দেখা হাতিটির স্মরণ হইতে পারে, ইহারই নাম স্মৃতি। যে বিষয়ে স্মৃতি হয়, সেই বস্তু সম্মুখে থাকার আবশ্যক নাই।

(৬) যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব সুখ দুঃখ জ্ঞান প্রভৃতির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তাহার নাম 'মন'। ঘ্রাণ, শ্রবণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় আপন-আপন বিষয়মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। গন্ধ ব্যতীত অপর কিছু গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নাই। এইভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ, কারণ তাহারা ভৌতিক।

মন ভৌতিক নয়, এইকারণে বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় তাহার প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নহে। কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান প্রমাণের সাহায্যে মনের অস্তিত্ব স্থির করা যায়। বিষয়বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলেও একই কালে একাধিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এইকারণে সাধারণ প্রত্যক্ষের বেলায় অপর একটি কারণ স্বীকার করিতে হয়। অনুমিত হইতে পারে যে, এমন একটি কারণ আছে, ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার সংযোগ হইলেই জ্ঞান জন্মিতে পারে, অন্যথা পারে না। সেই কারণরূপ বস্তুটি পরমাণুর মতো অতি সূক্ষ্ম বলিয়া একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার যোগ হইতে পারে না, এইকারণে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একই কালে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন

হয় না। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, দেখা, শোনা, গন্ধ গ্রহণ প্রভৃতি অনেকগুলি জ্ঞান যেন একই সময়ে সম্পন্ন হইল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে একই সময়ে হয় নাই, ক্রমিকত্ব আছে। আতশবাজির ঘূর্ণনক্রিয়ার ক্রমিকতা যদিও লক্ষ্য করা যায় না, তথাপি সেই ক্রমিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অতি দ্রুতগতিতে জ্বলিতে থাকে বলিয়া ক্রম লক্ষ্য করিতে পারি না, ইহা আমাদেরই ভ্রম। মনেরও গতি অতিশয় দ্রুত, এইকারণে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার ক্রমিক যোগ লক্ষ্য করিতে পারি না।

সর্বব্যাপক সকল দ্রব্যই স্থির, গতিশীল নহে, যথা আকাশ। যেহেতু মন গতিশীল চঞ্চল ("চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ,"— গীতা ৬।৩৪) সেইহেতু মন সর্বব্যাপী নহে, সুতরাং মন অণুপরিমাণ বা অতি সূক্ষ্ম। অন্তঃকরণ, চিত্ত, হৃদয় প্রভৃতি মনেরই পর্যায়শব্দ। স্ফটিক যেমন যে বর্ণের বস্তুর নিকটে থাকে, সেই বর্ণের বলিয়া প্রতিভাত হয়, মনও সেইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশত নানা আকারে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক প্রাণীরই একটি করিয়া মন।

(৭) শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা যে চেষ্টা বা প্রযত্ন করা হয়, তাহার নাম প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিই মানবের শুভ এবং অশুভ কর্ম। প্রবৃত্তি তিন প্রকার— শারীরিক, মানসিক ও বাচিক। দানাদির আচরণ শারীরিক শুভ প্রবৃত্তি। হিংসা পরপীড়ন প্রভৃতি শারীরিক অশুভ প্রবৃত্তি। দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানসিক শুভ প্রবৃত্তি, ঈর্ষ্যা দ্রোহ প্রভৃতি মানসিক অশুভ প্রবৃত্তি। সত্যভাষণ, হিতোপদেশদান প্রভৃতি বাচিক শুভ প্রবৃত্তি। মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি অশুভ বাচিক প্রবৃত্তি। সাধু বা শুভ প্রবৃত্তির ফল পুণ্য, অশুভ প্রবৃত্তির ফল পাপ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, পুণ্য ও পাপের জনক শুভ এবং অশুভ কর্মই প্রবৃত্তি। শুভাশুভ কর্ম হইতে উৎপন্ন পুণ্য এবং

পাপকেও প্রবৃত্তি শব্দেই প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু এই অর্থে প্রবৃ শব্দের প্রয়োগ মুখ্য নহে, গৌণ।

(৮) যাহা হইতে আমাদের কাজ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, যাহার প্রেরণায় ভালো বা মন্দ কর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার নাম 'দোষ'। দোষ তিন প্রকার— রাগ, দ্বেষ ও মোহ। দোষই পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির কারণ। রাগ শব্দের অর্থ বিষয়াসক্তি, মোহ আর মিথ্যাজ্ঞান একই বস্তু। কাম, মৎসর, স্পৃহা, লোভ প্রভৃতি রাগেরই অন্তর্গত। ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি দ্বেষের অন্তর্গত। অহংকার, সংশয়, বিমূঢ়তা প্রভৃতি মোহেরই প্রকারভেদমাত্র। মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই বুঝিতে হইবে, তাহার প্রবৃত্তির মূলে রাগ বা দ্বেষ বর্তমান। যাঁহার অনুরাগ এবং দ্বেষ নাই, তিনি উদাসীন পুরুষ। রাগ এবং দ্বেষের মূলে মোহের প্রেরণা থাকে। বস্তুসম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান উপস্থিত হইলে অনুরাগ বা দ্বেষ থাকিতে পারে না, যথার্থজ্ঞান না হইয়া মিথ্যাজ্ঞান হইলেই আসক্তি বা দ্বেষ জন্মে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিনটি দোষের মধ্যে মোহের শক্তিই সবচেয়ে বেশী, মোহই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান প্রতিবন্ধক। আত্মাই রাগ, দ্বেষ ও মোহের আশ্রয়। নিজের আত্মাতে রাগাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু অপরের প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার আত্মাতেও রাগাদি আছে, এই অনুমান করা যায়।

(৯) প্রেত্যভাব— প্রমেয় বর্গের নবম পদার্থ। 'প্রেত্য' শব্দের অর্থ মরণের পরে, আর ভাব শব্দের অর্থ উৎপত্তি। প্রেত্যভাব শব্দের অর্থ মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম। জীবাত্মার সহিত দেহের বিশিষ্ট সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকেই মরণ বলে, পুনরায় নূতন দেহের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের নামই জন্ম। জীবাত্মা নিত্য বলিয়া তাহার উৎপত্তি-বিনাশ না থাকিলেও বিশেষ সম্বন্ধে শরীর-সংযোগ ও শরীর-সংযোগের ধ্বংসই তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ।

জীবের এই জন্মমরণ-প্রবাহ অনাদি। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত, "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"— (গীতা ২।২৭) ইহা ন্যায়দর্শনেরও সিদ্ধান্ত।

(১০) প্রেত্যভাবের পর ফলের নির্ণয়। আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন, তাহার শেষ ফল সুখ অথবা দুঃখ। এই সুখদুঃখের অনুভবকে 'ফল' বলে। সুখদুঃখের অনুভবই কাজের মুখ্য ফল, শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও ফলের হেতু হইয়া থাকে, এইকারণে এইগুলি গৌণ ফল। কর্মানুষ্ঠান হইতে ধর্ম বা অধর্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ধর্ম হইতে সুখ ও অধর্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। পূর্ববর্ণিত দোষ বা অনুরাগাদি-বশত জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। মোহ বা মিথ্যাজ্ঞান যথার্থ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইকারণে আমরা সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করি। এই মোহ হইতেই বিষয়ে আসক্তি দ্বেষ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং আমরা কাজের প্রেরণা লাভ করি, এই প্রেরণায়ই কাজে প্রবৃত্ত হই। সাধু কাজে পুণ্য জন্মে, আর অসাধু কাজে পাপ জন্মে। পুণ্যের ফল সুখানুভূতি, আর পাপের ফল দুঃখানুভূতি।

(১১) দুঃখ সকল প্রাণীরই বিশেষ পরিচিত, দুঃখকে না জানিলে তাহার হাত হইতে অব্যাহতিলাভের ইচ্ছাই জাগিতে পারে না, সুতরাং দুঃখের জ্ঞান গৌণভাবে মুক্তিরও অনুকূল। পীড়া তাপ প্রভৃতি শব্দ দুঃখের সমানার্থক। দুঃখ স্বভাবত সকল প্রাণীরই অপ্রিয় এবং অনভিলষিত।

আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পদার্থ এবং সুখও গৌণভাবে দুঃখের মধ্যেই গণ্য। সাংসারিক সুখও ভবিষ্যৎ দুঃখেরই কারণ, এই সুখ প্রকৃত সুখ নহে। মুমুক্ষুব্যক্তি সংসারের সকল বস্তুকেই দুঃখ বলিয়া চিন্তা করিবেন, এইহেতু মহর্ষি গোতম প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখকে গ্রহণ করেন নাই। জীব সাংসারিক সুখে আসক্ত হইয়া মোহবশত নানাপ্রকার

কাজ করিয়া থাকে, তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অসংখ্য ক্লেশ ভোগ করে। এই কারণে সুখও দুঃখেরই অবস্থান্তর-মাত্র। সুখকেও দুঃখরূপে চিন্তা করিলে সংসারাসক্তি শিথিল হয়, সুখভোগ করিবার জন্য নানাপ্রকার কর্মের প্রবৃত্তিও আপনা হইতেই শিথিল হইয়া আসে। সুখকে দুঃখের বিপরীতরূপে চিন্তা করা মোক্ষমার্গের বিরোধী, এই কারণে প্রমেয়-বর্গে সুখের উল্লেখ করা হয় নাই।

(১২) "সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মা ভূৎ" আমি সুখী হইব, দুঃখ যেন আমার না থাকে, এই প্রকার বাসনা সকল প্রাণিজগতে চিরন্তন। সুখ এবং দুঃখ উভয়কেই আমরা মন দিয়া প্রত্যক্ষ করি, অনুভব ব্যতীত সুখ-দুঃখের বিষয় ভাষাতে বুঝানো যায় না, কারণ সুখ-দুঃখের অনুভব সকলের সমান নহে। একব্যক্তি যে অবস্থায় থাকিলে সুখী হন, অপরের পক্ষে সেই অবস্থাই পরম দুঃখের। রুচির বৈচিত্র্যে সুখ-দুঃখের অনুভবও বিচিত্র। দুঃখের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া থাকেন, দুঃখ কাহারও নিকট অভিনন্দিত হয় না, ইহা অতি সরল সত্য। যাহা প্রতিকূলভাবে অর্থাৎ স্বভাবত অপ্রিয়রূপে আমাদের অনুভবকে স্পর্শ করে, তাহাই দুঃখ। দুঃখের নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রাণিমাত্রেরই ইচ্ছা এবং তদনুকূল চেষ্টার স্বাভাবিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্য-সত্যই যদি দুঃখ নামে কিছু না থাকিত, তবে অনাদিকাল হইতে মানুষকে এত সংগ্রাম করিতে হইত না। যতদিন শরীর-ধারণ, ততদিনই এই যুদ্ধ। শরীরকে বাদ দিলে দুঃখের ভোগায়তনই থাকে না। যে অধিকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীব দুঃখ ভোগ করে, তাহাই ভোগায়তন। সুতরাং দেখা গেল, শরীরধারণ বা জন্মগ্রহণ করাই সকল দুঃখের মূল। জন্মের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আচার্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধর্মাচরণের ফল-স্বরূপ সুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত এবং অধর্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত জীব শরীরের সহিত বিশেষ একপ্রকার সম্বন্ধে যুক্ত হয়, ইহাই তাহার জন্ম।

ন্যায়াচার্যগণের মতে জীবের জন্ম এবং মরণ আছে, অথচ জীবসমূহ নিত্য। আপাতত এই দুইটি সিদ্ধান্তকে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বস্তুতপক্ষে ন্যায়মতে কোনো বিরোধ নাই। কারণ ন্যায়মতে শরীরের সহিত জীবাত্মার বিজাতীয় একপ্রকার সংযোগের নাম জন্ম এবং সেই সংযোগের ধ্বংসের নাম মরণ। জীবাত্মার তাহাতে কোনো অবস্থান্তর ঘটে না, জীব নিত্য এবং অপরিণামী। সাধু কর্মের আচরণে পুণ্য এবং অসাধু কর্মের আচরণে পাপ উৎপন্ন হয়। পাপ ও পুণ্য জীবাত্মাতে থাকে। এই পাপ-পুণ্যের ফলভোগের নিমিত্ত শরীরের সহিত জীবাত্মার উল্লিখিত বিশেষ একটি সম্বন্ধ ঘটে, যাহাকে জন্ম বলা হয়। শরীরকে বলা হয় সুখদুঃখ-ভোগের আয়তন, শরীর না থাকিলে সুখদুঃখ ভোগ করা চলে না।

শুভ প্রবৃত্তি হইতে ধর্ম এবং অশুভ প্রবৃত্তি হইতে অধর্মের উৎপত্তি হয়। শুভ এবং অশুভ প্রবৃত্তিরও নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, কারণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ-অনুসন্ধানে আচার্যগণ স্থির করিয়াছেন, যে-সকল বস্তুকে আমরা উপভোগ করিতে চাই, সেই সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি, আর যে-সব বস্তুকে চাই না, সেইগুলির প্রতি দ্বেষ এই দুইটি কারণ হইতে প্রবৃত্তি জন্মে। যিনি আসক্তিদ্বেষ-বর্জিত, ইষ্টানিষ্ট যাঁহার পক্ষে তুল্য, যিনি গীতার কথায় "নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি," "তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ", তিনি বৈষয়িক আসক্তিতে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন না, অথবা দ্বেষবশত কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে চান না। ইহাতে বুঝা গেল, শুভাশুভ প্রবৃত্তির মূল কারণ আসক্তি ও দ্বেষ। দার্শনিক ভাষায় এই উভয়কেই 'দোষ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। আসক্তি এবং দ্বেষের কারণ অনুসন্ধানে বলা হইয়াছে, ইহাদের মূলে আছে 'মিথ্যাজ্ঞান'। আমরা সাধারণত ইন্দ্রিয় শরীর প্রভৃতিকেই 'আমি' শব্দের বাচ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। 'আমি সুন্দর', 'আমি স্থূল',

"আমি অন্ধ', 'আমি বধির', 'আমি পণ্ডিত', 'আমি মূর্খ' ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ অনুভব আমরা করিয়া থাকি। এইসকল অনুভব হইতে জানা যাইতেছে, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনকেই আমি-রূপে বুঝিতেছি। অনাদিকাল হইতেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব এই প্রকার ভুল করিয়া আসিতেছে। এই ভুল জ্ঞানকেই দার্শনিকগণ 'মিথ্যাজ্ঞান' শব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি ধ্যান ধারণা প্রভৃতি যোগসাধনায় অথবা গুরুর উপদেশ শ্রবণে মিথ্যা-জ্ঞানের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্ত হন না, অথচ অনভিপ্রেত কোনো বিষয়ে তাঁহার দ্বেষও নাই। সুতরাং জানা যায়, মিথ্যাজ্ঞানই দোষের মূলীভূত কারণ। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিতে আমিত্ব-বুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের ফলেই আমরা আসক্তি ও দ্বেষের অধীন হই। এইরূপে অসংখ্য মিথ্যাজ্ঞান জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে বদ্ধ করিতেছে। মিথ্যাজ্ঞানের মোহে জীবের আসক্তি ও দ্বেষ জন্মে, রাগ-দ্বেষের তাড়নায় জীব শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টের উৎপত্তি হয় এবং অদৃষ্টের ফলরূপ সুখদুঃখকে ভোগ করিবার নিমিত্তই জীবকে পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ করিতে হয়। শরীর ধারণ করিলেই দুঃখ আমরণ সহচররূপে চলিতে থাকে। যদিও সংসারে দুঃখের সহিত সুখকেও উপভোগ করা যায়, তথাপি সাংসারিক সুখ অত্যন্ত দুঃখমিশ্রিত বলিয়া আচার্যগণ তাহাকেও দুঃখের মধ্যেই গণনা করিয়াছেন। সংসারে যে সুখ আছে, দার্শনিকদের দৃষ্টিতে তাহা কুপিত ফণীর ফণামণ্ডলের ছায়ার ন্যায়। সেই ছায়ার শীতলতা ভোগ করিতে গেলে দংশনদুঃখ অনিবার্য। যে দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত জীব এত ব্যাকুল, সেই দুঃখের মূলে আছে—মিথ্যাজ্ঞান। মূলকে নাশ করিতে না পারিলে তাহার শাখাপ্রশাখাকে নাশ করিলেও স্থায়ী ফল হইবে না। সাময়িকভাবে হয়তো মিথ্যাজ্ঞানের কিঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে, তথাপি মূলোচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত

হইবার উপায় নাই। চিরদিনের জন্য যিনি দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, মিথ্যাজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটন করাই তাঁহার পক্ষে একমাত্র ব্যবস্থা। মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, সত্যজ্ঞানকেই বলা হয় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান হইতে যে সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কার মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কারকে নাশ করে। মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার নাশ হইলে আর মিথ্যা-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না এবং কারণের অভাবে কার্যের উৎপত্তি হয় না বলিয়া মিথ্যাজ্ঞানরূপ কারণের অভাবে দোষরূপ কার্য উৎপন্ন হইবে না, দোষরূপ কারণের অভাবে প্রবৃত্তিরূপ কার্য উৎপন্ন হইবে না, প্রবৃত্তিরূপ কারণের অভাবে জন্মরূপ কার্যের উৎপত্তি হইবে না। জন্মরূপ কারণের অভাবে দুঃখের উৎপত্তি হইবে না। বর্তমান জন্মে দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিবে। এই প্রকার চিরকালের জন্য দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির নামই অপবর্গ, মুক্তি বা নির্বাণ।

ন্যায়বিদ্যার অনুশীলনে শরীর, আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং জগতের অপর অনেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়; সেই যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করিতে সমর্থ। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, আত্মার শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করা কর্তব্য। আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে বেদবাক্যের সহায়তায় যে বিচার করা হয়, তাহার নাম শ্রবণ। শ্রবণের পরেই হেতুর সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করার নাম মনন। ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা দ্বারা মনন সম্পন্ন হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি মননের সহায়তায় শ্রুতিলব্ধ তত্ত্বজ্ঞানকে সুদৃঢ় করেন। যে মিথ্যাজ্ঞান অনাদিকাল হইতে জীবের রাগদ্বেষাদির নিমিত্তরূপে দুঃখের কারণ হয়, শরীরাদিতে আমিত্ববোধের নিবৃত্তিতে সেই মিথ্যাজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যে বিষয়ে জীবের মিথ্যাজ্ঞান হয়, সেই বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। আত্মা, শরীর প্রভৃতি বারটি পদার্থকে মহর্ষি প্রমেয়বর্গের অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শরীরাদি দশটি

পূর্বোক্ত দোষের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখের হেতু বলিয়া এই দশটিকে বলা হয় 'হেয়'। অপবর্গ বা মুক্তি আত্মার লভ্য। এই প্রমেয়বর্গের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইলেই জীব মুক্ত হয়। ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির মুখ্য বা সাক্ষাৎকারণ। যতকাল পর্যন্ত এইসকল বস্তু-বিষয়ে জীবের যথার্থ জ্ঞান না জন্মিবে, ততকালই জীব বদ্ধ, ততকাল পর্যন্ত বিষয়ে আসক্তি, দ্বেষ প্রভৃতি কিছুতেই নাশ হইবে না। এইভাবে অনাদিকাল হইতে জীবের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। যতদিন এই প্রবাহের শেষ না হইবে, ততদিন মুক্তি হইবে না। রোগের চিকিৎসা করিতে চিকিৎসকগণ প্রথমেই কারণ অনুসন্ধান করেন। প্রকৃত কারণ স্থির করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করিলেই রোগ বিনষ্ট হয়। পিত্তজ জ্বরে পিত্তকে প্রশমিত করিতে পারিলেই জ্বরের বিরাম হয়, মুক্তির বেলায়ও ঠিক সেইরূপ মুক্তির প্রতিকূল দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেই মুক্তি হয়

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী ইহাদের সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন; মুক্তিতে আশ্রমবিশেষের কোনো অপেক্ষা নাই, ইহা নৈয়ায়িক-সিদ্ধান্ত। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, তিনি মুক্তিলাভের অধিকারী।

সুষুপ্তিকালে এবং প্রলয়াবস্থায়ও জীবের রাগদ্বেষ প্রভৃতি দুঃখজনক কিছুই থাকে না, তখন জীবের মুক্তি হয় না কেন? এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে, সুষুপ্তি এবং প্রলয়কালে রাগদ্বেষাদি দুঃখহেতু না থাকিলেও তাহাদের সংস্কার আত্মাতে থাকে। এই সংস্কার হইতে ভবিষ্যতে পুনরায় দুঃখোৎপত্তির আশঙ্কা থাকে, মুক্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয়, সংস্কারও থাকে না। সুতরাং সুষুপ্তি এবং প্রলয়ের সহিত মুক্তির অভেদ কল্পনা করা চলে না।

নৈয়ায়িকমতে আত্মার স্বভাবত চেতনা নাই, আত্মার সহিত মনের

যোগ হইলে তাহাতে চেতনা নামে বিশেষ একটি ধর্মের উৎপত্তি হয়, এইহেতু অচেতন আত্মাকেও চেতন বলা হয়। মুক্ত পুরুষের শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, এইকারণে মনঃসংযোগও হইতে পারে না, সুতরাং চেতনারও উৎপত্তি হয় না। শরীরের সহিত মুক্ত জীবের সম্বন্ধ কেন হয় না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শরীরের সহিত জীবের, সম্বন্ধের হেতু—ধর্ম এবং অধর্ম, ইহাদিগকে অদৃষ্টও বলা হয়। মিথ্যাজ্ঞানের নাশক তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই অদৃষ্ট বিলুপ্ত হয়, দেহ উৎপন্নই হইতে পারে না, সুতরাং জীবের সহিত সম্বন্ধ একেবারে অসম্ভব।

মুক্তি হইলে জীবের সুখানুভূতি থাকে কি না, এই বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষির সূত্রের তাৎপর্য— দুঃখের আত্যন্তিক বিচ্ছেদই অপবর্গ। সুখের অনুভব হয় কি না, এই বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কোনও কথা বলেন নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে মুক্তিতে সুখানুভূতি হয় না। "অপবর্গে সকল কার্যপ্রবাহের চিরনিবৃত্তি হয় বলিয়া বহু সুখও বিলুপ্ত হয়, এমন কি, চৈতন্যও তখন থাকে না। সুতরাং এইপ্রকার ভীষণ মূর্ছাবস্থা কাহারও কাম্য হইতে পারে না", এইরূপ আশঙ্কাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, অপবর্গ ভয়ানক বস্তু নহে, ইহা পরম শান্তির হেতু, অপবর্গে সকল কার্যের নিবৃত্তি হয়, লেশমাত্র দুঃখেরও অনুভব হয় না। সুতরাং বুদ্ধিমান্ পুরুষ নিশ্চয়ই মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন, কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই সজ্ঞানে বিষযুক্ত অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না, সেইরূপ সাংসারিক দুঃখমিশ্রিত সুখও বুদ্ধিমান্ পুরুষের উপভোগ্য হইতে পারে না। দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে যাহার চিত্ত জর্জরিত, অচেতন অবস্থাও তাহার কাম্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়, দুঃখের হাত হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত অনেকে আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

সাংসারিক সুখে প্রতিমুহূর্তে দুঃখের আশঙ্কা, সুখ সম্বন্ধে এইপ্রকার ধারণা যাঁহাদের বদ্ধমূল, তাঁহারাই মুক্তির প্রকৃত অধিকারী। যে-সকল আচার্য অপবর্গে সুখসংস্পর্শ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অনিত্য সুখ ত্যাগ করিয়া নিত্য সুখের উপভোগই যদি মুমুক্ষুগণের কাম্য হয়, তবে সেই সুখের উপভোগের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নিত্য শরীরেরও কামনা করিতে হইবে, যেহেতু শরীর ব্যতীত সুখদুঃখের অনুভব হয় না। শরীরের নিত্যতা সম্ভবপর নহে, শরীরমাত্রই বিনাশশীল। শরীরের নিত্যতা-কল্পনা যেমন অসম্ভব, সুখের নিত্যতা-কল্পনাও সেইরূপ অসম্ভব। শরীরের ন্যায় সুখদুঃখও অনিত্য ভাবপদার্থ-মাত্র। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন", "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি", ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দেখিয়া নিত্যসুখের কল্পনা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এইসকল শ্রুতিতে 'আনন্দ', 'রস' প্রভৃতি শব্দের অর্থ—দুঃখের অভাব। দুঃখের নিবৃত্তিকে সুখ বলিয়া সাধারণ লোকেও প্রয়োগ করিয়া থাকে। কোনো দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইলে 'আঃ, বাঁচিলাম', 'রক্ষা পাইলাম', 'সুখী হইলাম', ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করা হয়। সাময়িকভাবে জ্বর বিরাম হইলে 'বেশ ভালোই আছি', ইত্যাদি রোগীর মুখেও শোনা যায়।

আরও বলা হয় যে, নিত্যসুখের কামনা থাকিলেও মুক্তি হইতে পারে না। আসক্তির বন্ধনরূপে সকল কামনাই মুক্তির প্রতিকূল। পক্ষান্তরে শ্রুতিতেই পাওয়া যায় যে, মুক্ত পুরুষের সুখ বা দুঃখ কিছুই থাকিতে পারে না।

"অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ", এই শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, শরীর না থাকিলে সুখদুঃখের ভোগ করা চলে না।

মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে যে সুখ জন্মিবে, তাহা নিত্য হয় কিরূপে। পরে আর বিনাশ হইবে না, এইপ্রকার

তাৎপর্যেও নিত্য-শব্দ ব্যবহার করা চলে না। নৈয়ায়িক আচার্যদের মতে উৎপত্তিশীল যাবতীয় ভাববস্তুই বিনশ্বর। অতএব নিত্যসুখ নামে কোনো পদার্থই টিকিতে পারে না।

আরও জ্ঞাতব্য এই যে, 'মুচ্' ধাতু হইতে মুক্তিশব্দ নিষ্পন্ন হয়। মুচ্ ধাতুর অর্থও নিবৃত্তি। সুতরাং শব্দের যৌগিক অর্থের সামর্থ্যে বুঝা যাইতেছে, দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি। মুক্তিতে জীবাত্মার পাষাণাদির মতো জড়ত্ব ঘটে, ভাষ্যকারের এই অভিমত উদয়নাচার্য ও জয়ন্তভট্ট কর্তৃক যুক্তিপ্রমাণাদির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এইপ্রকার মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ নৈষধীয়চরিতের সপ্তদশ সর্গে চার্বাকের মুখে মহর্ষি গোতমকে গো-তম বলিয়া কঠোর বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাঁহার শ্লোকটি এই :

"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্ ।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ ॥"১৫

যিনি পাষাণের ন্যায় জড়ত্বরূপ মুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তোমরা তাহাকে গোতম বলিয়া তো জানই, পরন্তু তিনি যথার্থই গো-তম (শ্রেষ্ঠ গোরু)।

কোনো কোনো আচার্যের মতে মুক্তিতেও সুখের অনুভূতি হইয়া থাকে। মাধবাচার্য-বিরচিত শ্রীমচ্ছঙ্করদিগ্বিজয়-গ্রন্থে দেখা যায়, আচার্য শঙ্করের দিগ্বিজয়-সময়ে নৈয়ায়িক পণ্ডিত তাঁহাকে সগর্বে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তুমি যদি সর্বজ্ঞ হও, তবে কণাদসম্মত মুক্তি-পদার্থের সহিত গোতমসম্মত মুক্তির প্রভেদ আছে কি না বলো"। আচার্য উত্তরে বলিয়াছেন,

"অত্যন্তনাশে গুণসঙ্গতের্যা
স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে
সানন্দসংবিৎ-সহিতা বিমুক্তিঃ ॥" ১৬।৬৯

জীবের গুণসম্বন্ধ নাশ হইলে আকাশের ন্যায় অবস্থিতিই বৈশেষিক-

সম্মত মুক্তি, আর ন্যায়দর্শনের অভিপ্রেত মুক্তিতে জীবের আনন্দানুভূতিও থাকে। এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও মাধবাচার্যের মতো দার্শনিকপ্রবরের দর্শনসিদ্ধান্তে ভুল আছে, এইরূপ কল্পনা করা অত্যন্ত ধৃষ্টতা। সুতরাং কোনো কোনো নৈয়ায়িকসম্প্রদায় মুক্তিতে সুখানুভূতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। আচার্য শঙ্করকৃত সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-গ্রন্থেও নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক-সম্মত মুক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রভেদই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, শঙ্করাচার্যের পুর্ব হইতেই এক সম্প্রদায়ের ভিতরে ঐরূপ মতবাদ প্রচলিত ছিল। বাৎস্যায়নের খণ্ডন হইতেও এই মতের প্রাচীনত্ব অনুমিত হয়। শৈবাচার্য ভা-সর্বজ্ঞের সম্প্রদায় মুক্তিতে সুখানুভূতি মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথও সুখানুভূতি-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। আচার্য উদয়নের 'আত্মতত্ত্ব-বিবেকের' টীকায় মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতিবাদ সমর্থন করিয়া তিনি বলিয়াছেন, জীব সর্বদাই নিত্যসুখবিশিষ্ট। সাংসারিক জীব মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় নিত্যানন্দের উপভোগ করিতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে মিথ্যাজ্ঞানের অন্তর্ধানে নিত্যসুখের প্রকাশ হয়। তত্ত্বজ্ঞান নিত্যসুখের অনুভবের হেতু, আর মিথ্যাজ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধক। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্" এই শ্রুতিবাক্যই মুক্তিতে নিত্য-আনন্দের অস্তিত্বে প্রমাণ। শ্রুতিতে 'ব্রহ্মন্' শব্দের অর্থ জীব। কারণ, ব্রহ্মের বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই। বৃহৎ, বিভু বা মহান্, এই প্রকার অর্থের বোধক ব্রহ্মন্-শব্দে জীবকেও বুঝাইতে পারে। আনন্দ শব্দের দ্বারা (অস্ত্যর্থে অচ্-প্রত্যয়) আনন্দ-বিশিষ্টরূপ অর্থেরও জ্ঞান হইতে পারে। জীবের আনন্দবিশিষ্ট-স্বরূপ মুক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এইপ্রকার অর্থই উল্লিখিত শ্রুতি হইতে লাভ হয়। চিন্তামণিদীধিতির প্রারম্ভে তার্কিকশিরোমণি পরমাত্মাকে নমস্কার করিয়াছেন,

"ওঁ নমঃ সর্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দ-বোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে।"

(যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া অথবা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বর্তমান, অখণ্ড-আনন্দ-জ্ঞান-স্বরূপ সেই পূর্ণ পরমাত্মাকে নমস্কার।) যাঁহার উপাসনার ফলে নিত্য-আনন্দের অভিব্যক্তি হয়, অর্থাৎ জীব মুক্তিলাভ করে, তিনিই 'অখণ্ডানন্দবোধ' শব্দের বাচ্য। টীকাকার নব্যতার্কিক গদাধর ভট্টাচার্যও শিরোমণির নমস্কারবচনের তাৎপর্য-বিবৃতিতে বলিয়াছেন, মুক্তিতে নিত্যসুখানুভূতি-বাদ শিরোমণিরও অভিপ্রেত। 'মুক্তিবাদ' গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য শিরোমণির মতকে স্থান দিয়াছেন বটে, কিন্তু সমর্থন করেন নাই।

উল্লিখিত দুইটি মতের খণ্ডন ও মণ্ডনে বিস্তর বিচারপ্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক বিমুক্তি যে মুক্তিপদার্থ, তাহাতে কাহারও বিবাদ নাই। মুক্ত জীবের সুখানুভূতি যদি শ্রুতিসম্মত হয়, তবে ন্যায়দর্শনকেও অবনতশিরে সেই মত গ্রহণ করিতেই হইবে। বেদান্তদর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদে "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ" ইত্যাদি সূত্রে মুক্ত পুরুষের সুখানুভূতি উপনিষৎ-প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। উপনিষদের প্রকৃত তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্', এক-এক আচার্য এক-একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যাহা হউক, দুঃখবিমুক্ত জীবকে যে মুক্ত বলা হয়, এই বিষয়ে কোনো মতভেদ নাই। দুঃখের এই প্রকার আত্যন্তিক বিচ্ছেদই জীবের পরম-পুরুষার্থ বা নির্বাণমুক্তি।

মহর্ষি গোতমের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যপাতনিকায় একটি আশঙ্কা প্রকাশিত হইয়াছে,— মুক্তি কি তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই জন্মে, অথবা কিঞ্চিৎ বিলম্বে হয়? এই প্রশ্নের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, যদি তত্ত্বদর্শনের পরক্ষণেই শরীরের সহিত সম্বন্ধ ধ্বংস হয় এবং জীব মুক্ত-

হইয়া যায়, তবে তত্ত্বদর্শীর নিকটে কোনো উপদেশ পাওয়া কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। তত্ত্বদর্শী পুরুষও অপরের হিতের নিমিত্ত কিছুই করিয়া যাইতে পারেন না। তত্ত্বদর্শী ব্যতীত জগতের সকলেই মিথ্যাজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাঁহারা অপরকে উপদেশ দিবার অধিকারীই নহেন। যিনি তত্ত্বদর্শী, যাঁহার শরীর তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাঁহার নিকট অপরের কিছু আশা করাই বিড়ম্বনা। এই আশঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নাশক বটে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের পরক্ষণেই মুক্তি হয় না। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করে, মিথ্যাজ্ঞানের নাশ দোষকে নাশ করে, দোষের নাশ প্রবৃত্তিকে, প্রবৃত্তির নাশ জন্মকে এবং জন্মের নিবৃত্তি দুঃখকে নাশ করে। এইরূপে নাশ্য-নাশকের ক্রমিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের উত্তরের তাৎপর্য এই যে, মুক্তি দ্বিবিধ, পরা ও অপরা। নির্বাণমুক্তিকেই পরামুক্তি বলে, অপরামুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরক্ষণেই জন্মে, ইহাকেই বলে 'জীবন্মুক্তি'। তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের দ্বারা মুক্তিকাম পুরুষের পূর্বসঞ্চিত ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্ট বিলুপ্ত হয়, কিন্তু প্রারব্ধ অদৃষ্ট ভোগ ব্যতীত নাশ হয় না। অতএব জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত যতদিন শরীর ধারণ করেন, ততদিন তাঁহার নির্বাণ হয় না। এই সময়ে তিনি নানাবিধ উপদেশের দ্বারা মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,

"তাবদেবাস্ত চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে।"

প্রারব্ধভোগের নিমিত্ত জীবন্মুক্ত পুরুষকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। ভোগ শেষ হইলে দেহ নষ্ট হইয়া যায়। এই উভয় প্রকার মুক্তিই মহর্ষির অভিপ্রেত।

ঈশ্বরই কর্মফলের দাতা বা নিয়ন্তা, সকল কার্যেই তিনি নিমিত্তকারণ, তিনিই সকল কর্মের কারয়িতা এবং ফলদাতা, সুতরাং তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত জীবের মুক্তিও হইতে পারে না। ইহাই ন্যায়সম্মত অপবর্গের আলোচনা।

সংশয়

প্রমাণ ও প্রমেয় ব্যতীত সংশয়াদি যে চৌদ্দটি পদার্থ ন্যায়শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, অন্য কোনো শাস্ত্রে এইসকল পদার্থ বিষয়ে আলোচনা করা হয় নাই, ইহাই আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান। যে-বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সেই বিষয়ে কোনো যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না, যে-বিষয় ভালোরূপে জানি, তাহাতেও কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে বিষয়ে কিঞ্চিৎ জানি, ভালোরূপে জানি না অথচ সংশয় আছে, সেই বিষয়েই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব-বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিষয়ের সত্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা করি। এই কারণে সংশয়ও একটি পদার্থের মধ্যে গণ্য। একই বস্তুতে নানা বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞানের নাম, সংশয়। অন্ধকারে দূরে স্থিত ডালপালাশূন্য গাছের কাণ্ড দেখিয়া সংশয় জাগে, ইহা গাছের কাণ্ড না মানুষ? কাণ্ডের দীর্ঘতা ও বিস্তৃতি মানুষেরই মতো। যাহার সংশয় হয়, সেই ব্যক্তি গাছের কাণ্ড ও মানুষের মধ্যে সমান উচ্চতা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম আছে, সেই সকল ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া দূরে স্থিত বস্তুটিকে দেখিতেছে, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না।

(ক) এই প্রকার সংশয় উভয় বস্তুর সাধারণ বিশেষণের (ধর্মের) জ্ঞান হইতে জন্মে।

(খ) "শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য", এইরূপ সংশয় কেবল একই বস্তুর আসাধারণ বিশেষণের জ্ঞান হইতে জন্মিয়া থাকে। এই স্থলে শব্দত্বের জ্ঞান হইতেই সংশয় জন্মিতেছে। শব্দের অসাধারণ ধর্ম—শব্দত্ব। শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপ কোনো বিশেষ ধর্মের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যাঁহার নাই, তাঁহারই শুধু শব্দত্বরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান হইতে, 'শব্দ নিত্য না অনিত্য' এই সংশয় জন্মে। সংসারে বস্তুমাত্রই হয় নিত্য, না-হয় অনিত্য, এই জ্ঞান থাকায় নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব বিষয়ে স্মৃতি জাগে এবং সংশয় হয়।

(গ) একই বিষয়ে এক সময়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা শুনিলে সংশয় উপস্থিত হয়। একব্যক্তি বলিলেন, 'জগৎ সত্য', অপর ব্যক্তি বলিলেন, 'জগৎ মিথ্যা'। এই পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য দুইটি যাঁহারা শুনিবেন, জগতের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব বিষয়ে তাঁহাদের সংশয় উপস্থিত হইবে। পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হইতে এইপ্রকার সংশয় উপস্থিত হয়।

(ঘ) জলাশয়ে জল দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব স্থির করিতে পারি। মরীচিকা বাস্তবিক জল নহে, তথাপি জলরূপে ভুল ধারণা করিয়া থাকি। সুতরাং দেখিতেছি, সকল সময় কেবল সত্যবস্তু বিষয়েই জ্ঞান হয়, এমন নহে, ভুলবশত অনেক মিথ্যা বস্তুরও কল্পনা করিয়া থাকি। এইকারণে যে বস্তু বিষয়েই জ্ঞান হউক না কেন, বস্তুটি সত্য কি মিথ্যা, এই সংশয় সকল বিষয়েই হইতে পারে।

(ঙ) আকাশ-কুসুম, কচ্ছপের লোম, শশকের শিং, প্রভৃতি যে সকল বস্তু মোটেই নাই, অর্থাৎ অলীক, সেইগুলি দেখা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। আবার প্রকৃত সত্য অনেক বস্তুও সকল সময় দেখা যায় না; মাটির নীচে কত কিছু আছে, কিন্তু আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। অন্ধকারে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু খুঁজিয়া না পাইলে সেই বস্তুটি সেখানে আছে, অন্ধকারের দরুণ পাওয়া গেল না, অথবা সেখানে নাই বলিয়াই পাওয়া গেল না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরে আলোর সাহায্যে সন্দেহ দূর করিয়া থাকি। এইপ্রকার সংশয় অনুপলব্ধি হইতে জন্মে।

প্রয়োজন

আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন, তাহার একটা উদ্দেশ্য থাকে, পূর্বে মনে মনে উদ্দেশ্য স্থির না করিয়া কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই কাজে প্রবৃত্ত হন না, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই প্রয়োজন। প্রাপ্য বস্তুর ন্যায় ত্যাজ্য বস্তুবিষয়েও জীবের প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তি পরিত্যাগের প্রবৃত্তি। অতএব প্রাপ্য বা ত্যাজ্যরূপে স্থির করিয়া যে পদার্থের প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ বিষয়ে জীব প্রবৃত্ত হয়, সেই পদার্থের নাম— প্রয়োজন। প্রয়োজন দুইপ্রকার, মুখ্য ও গৌণ। আমরা যে কোনো উদ্দেশ্য লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হই না কেন, সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনাশ তাহার শেষ লক্ষ্য, অতএব সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি মুখ্য প্রয়োজন, আর এই দুইটি প্রয়োজনের যত কিছু উপায় বা পন্থা, সবই গৌণ প্রয়োজন।

দৃষ্টান্ত

যাহাদের বুদ্ধি বিশেষ মার্জিত নহে, চল্‌তি ভাষায় যাহাদিগকে 'সাধারণ লোক' বলা হয়, তাহারা যে বস্তুকে যে-ভাবে দেখিয়া থাকে, যদি মার্জিতবুদ্ধি লেখাপড়া-জানা লোকও সেই বস্তুটিকে সেইভাবেই দেখেন, তবে সেই পদার্থটিকে বলা হয় 'দৃষ্টান্ত'। পঞ্চাবয়ব ন্যায়-প্রয়োগে উদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিতে হয়, পরার্থানুমানের আলোচনায় তাহা বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত পদার্থের জ্ঞান না হইলে উদাহরণ দেখানো যায় না, এইকারণে দৃষ্টান্তকে পদার্থরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনেক কিছু বুঝা যায়, অন্যকেও বুঝানো যায়, দৃষ্টান্ত ব্যতীত কেবল যুক্তিতর্কে বিষয়বস্তু পরিষ্কার করিয়া বুঝানো কঠিন।

সন্দিগ্ধ বিচার্যবিষয়ে আত্মপক্ষ-সমর্থন ও পরপক্ষ-খণ্ডনে দৃষ্টান্তই প্রধান সহায়ক। সুতরাং দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বস্তুকে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেই বুঝিতে পারেন। শুধু পণ্ডিতদের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া আলোচনা চলিলে, যাহা অপণ্ডিতের অবোধ্য, সেইরূপ দৃষ্টান্তও চলিতে পারে। যে বস্তুবিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর মতের ঐক্য নাই, তেমন বস্তুকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। দৃষ্টান্ত দুইপ্রকার, সাধর্ম্য-দৃষ্টান্ত ও বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত। কোনো সাধারণ ব্যক্তিকে বুঝাইবার নিমিত্ত যদি বলা হয়, যেহেতু এইস্থানে ধূম আছে, সেইহেতু অবশ্যই আগুন আছে, যথা পাকঘর, এইস্থলে পাকঘরকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইতেছে। ইহা সাধর্ম্য-দৃষ্টান্ত।

"জীবিত শরীরে প্রাণ আছে, অতএব উহাতে আত্মাও আছে"। প্রতিপক্ষ আত্মা নামে কোনো পদার্থ স্বীকার করেন না, সুতরাং এইস্থলে সর্বসম্মত সাধর্ম্য-দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অগত্যা বলিতে হয়, "যাহা সাত্মক নহে, তাহা প্রাণযুক্ত নহে, যথা ঘট"। এই দৃষ্টান্ত বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত। অবয়বের অন্তর্গত উদাহরণ-বাক্য এবং দৃষ্টান্তবোধক বাক্য একই, ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

সিদ্ধান্ত

কোনো বিষয়ে মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত করিতে গেলেই দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়, এইকারণে দৃষ্টান্তপদার্থের পরেই মহর্ষি সিদ্ধান্তের নিরূপণ করিয়াছেন। কোনও বিচার্য বিষয়ে ভুল ধারণা বা সংশয় থাকিলে শাস্ত্রের সাহায্যে যথার্থ ধারণায় পৌছানো যায়, এইকারণে শাস্ত্রের যথাযথ অর্থের নাম সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,

সর্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম। এইগুলি একমাত্র শাস্ত্রীয় পরিভাষা বা সংজ্ঞা।

(ক) সকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে সিদ্ধান্ত নিজের শাস্ত্রে গৃহীত হয়, তাহার নাম সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন চক্ষু, ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়। এইসকল সিদ্ধান্ত সকল শাস্ত্রেই স্বীকার করা হইয়াছে, ন্যায়দর্শনেও মহর্ষি এইসকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব এইসকল সিদ্ধান্ত সর্বতন্ত্র।

(খ) যে সিদ্ধান্ত নিজের শাস্ত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু অন্যের শাস্ত্রে অনাদৃত, সেই সিদ্ধান্তের নাম 'প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত।' যেমন মীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত,— শব্দ নিত্য। ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শনে শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অতএব মীমাংসকদের পক্ষে শব্দের নিত্যতা এবং ন্যায়বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের শব্দের অনিত্যতা "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত"।

যে সিদ্ধান্ত সমান-তন্ত্রসিদ্ধ, পরতন্ত্রসিদ্ধ নহে, সেই সিদ্ধান্তকেও 'প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত' বলে। যেমন, 'অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হয় না', 'সতের বিনাশ নাই', 'আত্মা গুণহীন', সাংখ্যাচার্যদের এইসকল সিদ্ধান্ত প্রতিতন্ত্র। যেহেতু এইসব সিদ্ধান্ত শুধু পাতঞ্জলদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল-দর্শনেও সাংখ্যদর্শনের বিষয়বস্তুকেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে এবং উভয় দর্শনের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই সমান। এইকারণে পাতঞ্জল ও সাংখ্য পরস্পর সমানতন্ত্র। এইসকল সিদ্ধান্ত সাংখ্যশাস্ত্রের পরতন্ত্র ন্যায়বৈশেষিকের সম্মত নহে। 'অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হয়', 'উৎপন্ন পদার্থের বিনাশ হইয়া থাকে', 'বুদ্ধি প্রভৃতি গুণপদার্থ আত্মাতে থাকে', এইসকল সিদ্ধান্ত ন্যায়-বৈশেষিকের মতে 'প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত'। কারণ সাংখ্যতন্ত্রে এইসকল সিদ্ধান্ত নাই।

(গ) যে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিষয়ও স্থির হইয়া যায়, তাহার নাম 'অধিকরণ-সিদ্ধান্ত'। যদি বলি, এই সৃষ্টির মূলে কোনও অদৃশ্য পুরুষের হাত আছে, তখন বুঝিতে হইবে, জগতের সমস্ত বস্তুবিষয়ে সেই পুরুষের জ্ঞানও আছে। এই সিদ্ধান্ত আপনা আপনিই স্থাপিত হয়। আমরা দেখিতে পাই, যিনি কোনও বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি সেই বস্তুসৃষ্টির উপযোগী উপাদানাদি সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। মৃত্তিকাবিষয়ে কুম্ভকারের কোনো জ্ঞান নাই, ইহা বলা চলে না। সুতরাং সেই অদৃশ্য পুরুষের সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান আছে, ইহা মানিয়া লইতে হইবে।

(ঘ) চতুর্থ সিদ্ধান্তের নাম অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। প্রতিবাদীর উক্তি সংগতই হউক আর অসংগতই হউক, সেই বিষয়ে বিচার না করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াই প্রতিবাদীর সহিত বিচার করার নাম অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত। মনে করুন, রাম ও শ্যামের মধ্যে কোনও বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলিতেছে। রাম কোনও নূতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে আপন পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। শ্যাম যদি ঐ সিদ্ধান্ত অনভিমত হইলেও তাহাকে মানিয়া লইয়া তর্ক করিতে থাকেন, তখন বুঝিতে হইবে, রামের উদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত শ্যামেরও স্বীকৃত। সাধারণত দেখা যায়, প্রতিপক্ষের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং নিজের বুদ্ধিকৌশল দেখাইবার নিমিত্ত বিচারে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্তকে মানিয়া লওয়া হয়। "তোমার মত আমার অনভিমত হইলেও মানিয়া লইলাম, তথাপি তোমার পক্ষ স্থাপন করিতে পারিতেছ না; কারণ তাহাতে আরও দোষ আছে", এইভাবে স্বীকার করার নাম অভ্যুপগম।

অবয়ব

অবয়ব শব্দে বস্তুর অংশকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু এই অবয়ব শব্দ পারিভাষিক, ইহার অর্থ ন্যায়বাক্যের অংশ। পরার্থানুমানে যে-সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, সেই বাক্যসমষ্টিকে ন্যায় বলে। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়বের বিষয় অনুমান-প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে।' অতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ দশটি অবয়ব স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি ব্যতীত জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন ও সংশয়ব্যুদাস এই পাঁচটি বেশী স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি গোতম পঞ্চাবয়ববাদী।

তর্ক

গোতমের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক-পদার্থ প্রমাণের সহায়ক জ্ঞানবিশেষ। যে-বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ জানা যাইতেছে না, অথচ বিচারের সাহায্যে জানিতে হইবে, সেই বিষয়ে বিচার করিতে যাইয়া সন্দিহ্যমান দুইপক্ষের মধ্যে "এই বিষয়েই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে", এইপ্রকার সম্ভাবনা অর্থাৎ মানস জ্ঞানবিশেষের নাম তর্ক। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ে আমাদের কোনও প্রশ্ন উঠে না, যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট, কিঞ্চিৎ ধারণা থাকিলেও পরিষ্কার কোনো ধারণা নাই, সেই বিষয়ে নিঃসংশয়রূপে জানিতে হইলেই তর্কের প্রয়োজন। তর্ক যে শুধু অনুমানেরই সহায়ক, তাহা নহে, সকল প্রমাণেই তর্কের বিশেষ স্থান আছে। তর্কের উদ্দেশ্য সংশয়নিরসন। কোনো বস্তুবিষয়ে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিলে সেই বস্তুকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষভাবে জানিতে গেলেই "ইহা এইপ্রকার কিংবা এইপ্রকার নহে", এইরূপ সংশয়

উপস্থিত হয়। সংশয় নিরাস করিতে উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষের অনুকূলে কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, সেই পক্ষেই আমরা সায় দিয়া থাকি। এই সায়-দেওয়া বা সম্ভাবনাকেই নৈয়ায়িকগণ তর্ক নামে প্রকাশ করিয়াছেন। মনে করুন, একব্যক্তি আত্মার বিষয়ে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছুক। প্রথমেই তাঁহার সন্দেহ হইল "আত্মা নিত্য না অনিত্য?" যদি নিত্য হয়, তবে আমার এই শরীর ধারণের পূর্বেও আত্মা ছিল, তখন অপর শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধও ছিল, অন্যথা অশরীরী আত্মা কোনও কাজ করিতে পারিত না। কাজ না করিলে ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত বর্তমান শরীর ধারণও করিতে হইত না। অতএব আত্মাকে নিত্যস্বরূপ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে, জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘটিতেছে এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে শরীরের সহিত আত্মার আর সম্বন্ধ ঘটিবে না, অর্থাৎ মুক্তিলাভ হইবে।

পক্ষান্তরে আত্মা অনিত্য হইলে তাহার শরীর ধারণরূপ জন্ম এবং মুক্তি সম্ভবপর হয় না। কেননা, আত্মা যদি অনিত্য হয়, তবে প্রত্যেক নূতন নূতন শরীরের সহিত নূতন নূতন আত্মার সম্বন্ধ হয় এবং শরীরের নাশে আত্মারও নাশ হয়। একই বিনশ্বর আত্মা জন্মজন্মান্তরে নূতন নূতন শরীর গ্রহণ করিতে পারে না। ইহজন্মে যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করা হয়, তাহা পূর্বজন্মের কর্মফল হইতে উৎপন্ন। যদি বর্তমান শরীরে সম্বদ্ধ আত্মা পূর্বজন্মে না থাকে, তবে অন্য আত্মার অনুষ্ঠিত কর্মের জন্য কেন সে ফলভোগ করিবে। ভোগের অন্তে কিরূপেই বা তাহার মুক্তি হইবে? জগতের সকলেই সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, অপলাপ করা চলে না। অতএব আত্মার অনিত্যতা যুক্তিসিদ্ধ নহে, নিত্যতাই সম্ভবপর, এইরূপ বিচারণা বা সম্ভাবনাই নৈয়ায়িক-সম্মত তর্কপদার্থ।

পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, একপ্রকার আরোপের নাম তর্ক। যথা, যদি জলে ধূম থাকিত, তবে আগুনও থাকিত; যেহেতু ধূম নাই, সেইহেতু আগুনও নাই। তর্ক যদিও নিজে প্রমাণ নহে, তথাপি প্রমাণের সত্যতা-নির্ণয়ে প্রমাণকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয় বা অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও অনিষ্টপ্রসঙ্গ, এই পাঁচভাগে তর্ককে বিভাগ করা হয়।

নির্ণয়

বিচারে অন্য পক্ষের অবলম্বিত যুক্তিতে দোষ দেখাইয়া আপন পক্ষ স্থাপনপূর্বক বিচার্য বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত বা নিশ্চয় করার নাম নির্ণয়। তর্কের শেষ ফল নির্ণয়। সাধারণত কোনো বিষয়ে সংশয় হইলেই নির্ণয়ের আবশ্যক হয়, কিন্তু সংশয় না থাকিলেও নির্ণয় হইতে পারে। যেমন, কোনো বস্তু চোখে দেখিয়া 'ইহা অমুক বস্তু' এইরূপ স্থির করা। বিচারের বেলায় বাদী ও প্রতিবাদী যদিও আপন আপন যুক্তিতর্কের উপর বিশেষ আস্থাবান্ থাকেন, তথাপি মধ্যস্থ শ্রোতা উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনিয়া বিচার্য বিষয়ে সংশয়াপন্ন হন। এক পক্ষ নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত মধ্যস্থ ব্যক্তি তাহা অনুমোদন করিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় বাদী ও প্রতিবাদীর যুক্তিতর্ক বিন্যাসের দ্বারা মধ্যস্থ ব্যক্তি একতর পক্ষ স্থির করিয়া থাকেন, সেই স্থির করা বা অবধারণের নামই নির্ণয়। সময়-বিশেষে ভ্রমাত্মক নির্ণয়ও হইতে পারে; প্রমাণে দোষ থাকিলে নির্ণয়ে ভুল নিশ্চিত। মধ্যস্থ শ্রোতা না রাখিয়াও গুরুশিষ্যাদির মধ্যে বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া যে তত্ত্বাবধারণ করা হয়, সেই অবধারণও নির্ণয়-পদার্থ।

কী উপায়ে শাস্ত্রীয় বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়, তাহার উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত মহর্ষি গোতম কয়েকটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

বাদ

সন্দিগ্ধ বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় অথবা প্রতিবাদীকে নিগৃহীত করার উদ্দেশ্যে ন্যায়ানুগত বচন-প্রয়োগকে 'কথা' বলে। কথা তিনপ্রকার— বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। কোনো বস্তুর সত্যতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে দুইজনের মধ্যে সেই বিষয়ে ন্যায়ানুসারে শাস্ত্রীয় বিচারের রীতিতে যে আলোচনা হয়, তাহাকে 'বাদ' বলে। বাদ-কথাতে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই লক্ষ্য তত্ত্বনির্ণয়, বিচারে একে অন্যকে জব্দ করা বাদ কথার উদ্দেশ্য নয়, জয়-পরাজয়ের কোনো লক্ষ্য তাহাতে থাকে না। বাদবিচারে শাস্ত্রীয় কোনো সিদ্ধান্তের অপলাপ করা অনুচিত। বিচারপদ্ধতি ঠিকরূপে চলিতেছে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বাদকথাতে কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তির আবশ্যক হয় না। বাদে নিরর্থক কথা কাটাকাটির স্থান নাই, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কথা বাদে উঠিতে পারে না। বাদবিচার অতি প্রশংসিত, গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন, "বাদঃ প্রবদতামহম্।" (১০।৩২)

শাস্ত্রীয় বিচারের নিয়ম এই যে, যেখানে আরো পাঁচজন পণ্ডিত বা শাস্ত্ররসিক থাকেন, সেই জায়গায় বসিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে হয়। যে দুইজনের মধ্যে বিচার চলিবে, তাঁহাদের প্রশ্নকর্তাকে বলা হয় বাদী বা পূর্বপক্ষবাদী; আর যিনি উত্তর দিবেন, তাঁহার সংজ্ঞা প্রতিবাদী বা উত্তরপক্ষবাদী। যিনি উভয়ের কথার দোষগুণ বুঝিয়া যথাসময়ে তাহা উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, তেমন একজন বিচক্ষণ পণ্ডিতব্যক্তিকে বিচারে মধ্যস্থরূপে রাখিবার রীতি আছে। প্রথমত বাদী বিচার্য বিষয়টি সভায় উপস্থিত করিয়া শাস্ত্রযুক্তি বলে আপন পক্ষ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদীকে বুঝাইতে যাইবেন। প্রতিবাদী বাদীর কথার দোষত্রুটি প্রদর্শন করিবেন। এইরূপে দুইপক্ষে বিচার চলিবে। পরিশেষে যিনি নিজ পক্ষে প্রতিপক্ষের

উদ্ভাবিত দোষের উদ্ধার করিতে পারিবেন না, অথবা প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কে কোনো দোষ দেখাইতে পারিবেন না, তিনিই বিচারে পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন। উভয় পক্ষের কথাবার্তার ভিতরে যে সকল দোষ থাকিবে, মধ্যস্থব্যক্তি তাহা যথাসময়ে দেখাইয়া দিবেন। যিনি বিচারের এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, তিনিও পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন। উল্লিখিত বাদবিচারে এইসকল নিয়ম নাই, পণ্ডিত সভারও প্রয়োজন হয় না, যেহেতু সেখানে জয়পরাজয়ের কোনো প্রশ্নই নাই। যাঁহারা তত্ত্ব-নির্ণয়ে ইচ্ছুক, শাস্ত্রপ্রকৃতি, যুক্তিসিদ্ধ অর্থের অপলাপ করেন না, বিচারে প্রতিপক্ষকেও সাহায্য করেন, তাঁহারাই বাদকথায় অধিকারী। উল্লিখিত বিচারপ্রণালীর শ্রেষ্ঠতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

জল্প

জল্পও একপ্রকার বিচার, কথার মধ্যে গণ্য। বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে যে বিচার প্রবর্তিত হয়, তাহারই নাম 'জল্প'। জল্পে বাদী ও প্রতিবাদী আপন আপন মতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অশাস্ত্রীয় রীতিতেও বিচার করিয়া থাকেন। যেন তেন প্রকারেণ স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষ খণ্ডন করাই জল্পকথার উদ্দেশ্য। জল্পবিচারে সুপণ্ডিত মধ্যস্থের আবশ্যক।

বিতণ্ডা

বিতণ্ডাতে বাদী এবং প্রতিবাদীর কোনো লক্ষ্য নাই, শুধু প্রতিপক্ষের অভিমত খণ্ডনের নিমিত্ত বিজিগীষু বিচারক যে বচন বিন্যাস করেন, তাহাই 'বিতণ্ডা'। বৈতণ্ডিক শাস্ত্রের কোনো ধার ধারে না, আত্মপক্ষ সমর্থন করিবারও তাঁহার প্রয়োজন নাই। প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিতে পারিলেই বৈতণ্ডিকের পক্ষ স্থাপিত হয়, ইহা মনে করিয়া বৈতণ্ডিক

আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে ব্যগ্র হন না। কথার মধ্যে যদিও বিতণ্ডাই সর্বাপেক্ষা নিন্দিত, তথাপি বিচারসভায় ক্রুদ্ধ হইয়া কলহ করা অথবা সর্বজনসিদ্ধ অনুভবকে বাদ দেওয়া বৈতণ্ডিকের পক্ষেও অনুচিত। এরূপ ব্যক্তি বিতণ্ডারও অধিকারী নহেন। জল্প ও বিতণ্ডাতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতির উদ্ভাবন করিতে হয়। এইবিষয়ে পরে বলা হইবে।

বাদবিচারে তত্ত্বনির্ণয় হয়, শাস্ত্রীয় জ্ঞান দৃঢ় হয়, সুতরাং মুমুক্ষুর পক্ষেও বাদবিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডাপদার্থের জ্ঞান মুমুক্ষুর কী কাজে লাগিবে। এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন, স্থলবিশেষে মুমুক্ষুর পক্ষেও জল্প এবং বিতণ্ডার প্রয়োজন হয়—

তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে
বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ। ৪।২।৫০

জমিতে বীজ রোপণ করিলে গোরু মহিষ প্রভৃতি পশু হইতে অঙ্কুর রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাঁটা ডালের বেড়া দিতে হয়, সেই বেড়া জমির আবরণরূপে অঙ্কুরকে রক্ষা করিয়া থাকে। মুমুক্ষু ব্যক্তিও তাঁহার প্রথমোৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরকে জল্প ও বিতণ্ডার বেড়া দিয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। গুরুমুখে তত্ত্ব শ্রবণ করিলেও সেই তত্ত্বজ্ঞান যাঁহাদের সুদৃঢ় হয় নাই, তাঁহারা গুরুর উপদেশে পুনঃ পুনঃ মনন করিবেন। নাস্তিকগণ সেইসময়ে যদি তাঁহাদের নিকট আপন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হন, তবে মননকারীদের তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরের মূল শিথিল হইবার আশঙ্কা থাকে, তখন আপন আপন তত্ত্বনিশ্চয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে উপায়েই হউক, নাস্তিককে পরাস্ত করা চাই। অগত্যা জল্প-বিতণ্ডার আশ্রয়ও লইতে হইবে। কিন্তু ধনলাভ বা লোকসমাজে

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে কখনও জল্প বা বিতণ্ডা করিতে নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই কথাই বলিয়াছেন,

তদেতদ্ বিদ্যাপরিপালনার্থং, ন লাভপূজাখ্যাত্যর্থমিতি।

হেত্বাভাস

অনুমান প্রয়োগের বেলায় যে হেতু দোষযুক্ত, তাহাকে 'হেত্বাভাস' বলে। হেতুর সাধুতা এবং অসাধুতা সম্বন্ধে যিনি বিশেষভাবে জানেন না, তিনি বাদাদিবিচারে অধিকার লাভ করিতে পারেন না, এইকারণে কথা-নির্ণয়ের পরেই হেত্বাভাসকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। হেত্বাভাস সম্বন্ধে আলোচনা অনুমান-প্রকরণেই করা হইয়াছে।

ছল

বক্তা যে তাৎপর্যে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহার বিপরীত অর্থের কল্পনা করিয়া বক্তার বাক্যে দোষ উদ্ভাবন করার নাম 'ছল'। ছল ত্রিবিধ, বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল। বাদীর কথার বিকৃত অর্থ করিয়া তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করা বাক্‌ছলের উদ্দেশ্য। এক ব্যক্তি বলিলেন, 'অমুকের রাগ খুব বেশী।' এখানে ক্রোধার্থে রাগশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদী প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়াও বলিলেন, "অমুকের অনুরাগ আছে কে বলে?" বাদী বলিলেন, "হাতির বিষাণ আছে।" বিষাণ শব্দ এখানে দন্তরূপ অর্থে প্রযুক্ত। প্রতিবাদী বলিলেন, "হাতীর আবার শিং কোথায়?" (বিষাণ শব্দে দাঁত ও শিং দুইই বুঝায়।) এইরূপে শব্দের অনভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করিবার সময় বাক্‌ছলের আশ্রয় লইতে হয়।

একস্থলে যে অর্থ সম্ভবপর, অন্যত্র অসম্ভব হইলেও শুধু সাদৃশ্যের জোরে সম্ভবপরতা কল্পনা করার নাম 'সামান্যচ্ছল'। বাদী বলিলেন,

"ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন।" প্রতিবাদী তখন এক ব্রাহ্মণ-শিশুকে দেখাইয়া বলিলেন, "কই, এই ব্রাহ্মণ কি শাস্ত্রালোচনা করেন"। ব্রাহ্মণশিশুর পক্ষে শাস্ত্রালোচনা অসম্ভব জানিয়াও শুধু 'ব্রাহ্মণ' এইমাত্র সাদৃশ্যের জোরে বাক্যে দোষ দেখানো হইল। অতএব প্রতিবাদীর এই উত্তর 'সামান্যচ্ছল'।

শব্দের মুখ্য ও গৌণ দুইপ্রকারের অর্থ আছে। বক্তা মুখ্য অর্থে বা গৌণ অর্থে বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষ প্রদর্শন করার নাম 'উপচারচ্ছল'। বক্তা বলিলেন, 'গঙ্গায় গ্রাম আছে।' এখানে গঙ্গা শব্দের গৌণ সামর্থ্য দ্বারা গঙ্গাতীরকে বুঝানোই বক্তার উদ্দেশ্য। প্রতিবাদী ছল করিয়া বলিলেন, 'গঙ্গাজলে তো গ্রাম দেখিতেছি না।' ইহাই উপচারচ্ছল।

জাতি

ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া শুধু সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা বাক্যে দোষের উদ্ভাবন করাকে 'জাতি' বলা হয়। জাতি চব্বিশ প্রকার। 'সাধর্ম্যসমা', 'বৈধর্ম্যসমা', ''উৎকর্ষসমা' প্রভৃতি

ঘট প্রভৃতি বস্তু উৎপন্ন হয়, বিনষ্টও হয়। শব্দ উৎপত্তিশীল, সুতরাং শব্দের বিনাশও হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তে দোষ উদ্ভাবন করিয়া জাতিবাদী বলিয়া থাকেন, যদি অনিত্য ঘটের ন্যায় উৎপত্তিশীল বলিয়া শব্দের বিনাশ স্বীকার করিতে হয়, তবে আকৃতিহীন নিত্য আকাশের মতো শব্দও আকৃতিহীন বলিয়া নিত্য হইতে পারে। প্রতিবাদীর এই উত্তরের নাম 'সাধর্ম্যসমা' জাতি।

অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্য অমূর্তত্ব শব্দে আছে বলিয়া প্রতিবাদী যদি শব্দের নিত্যতায় আপত্তি করেন, তবে 'বৈধর্ম্যসমা' জাতির উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায়।

ঘট উৎপন্ন হয়, সুতরাং অনিত্য। শব্দও উৎপন্ন হয়, অতএব ঘটের ন্যায় অনিত্য, এইরূপে বাদীর কথার উত্তরে, "ঘটে রূপ থাকে, শব্দ যদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হইত, তবে শব্দেও রূপ থাকিত" প্রতিবাদীর এইপ্রকার দোষোদ্ভাবনের নাম 'উৎকর্ষসমা' জাতি।

প্রতিবাদীর এইসকল উত্তর ভিত্তিহীন, কারণ তিনি যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা টিকিতে পারে না। অমূর্ত পদার্থই যে নিত্য হইবে, এরূপ কোনো নিয়ম নাই, রূপ প্রভৃতি বহু অমূর্ত পদার্থ অনিত্য হইয়া থাকে। গ্রন্থবিস্তৃতির ভয়ে জাতির অপরাপর উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না।

নিগ্রহস্থান

নিগ্রহস্থানই গোতমের শেষ পদার্থ। বিচারে পরাজয়ের নাম নিগ্রহ, নিগ্রহের স্থান অর্থাৎ কারণকেই 'নিগ্রহস্থান' বলে। যে-সকল বাক্যে বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ের বিপরীত জ্ঞান, অথবা বিচার্য বিষয়ে অপ্রতিপত্তি (অজ্ঞানতা) প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'নিগ্রহস্থান'।

নিগ্রহস্থান বাইশ প্রকার। প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ প্রভৃতি।

বাদী বা প্রতিবাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চ অবয়বের প্রয়োগ করিয়া আপন পক্ষ স্থাপন করেন। যদি প্রতিপক্ষের প্রদর্শিত দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন, তবে তিনি প্রতিজ্ঞাহানি নামক নিগ্রহস্থানে পরাজিত হন। বাদী বলিলেন, শব্দ অনিত্য, তারপর হেতুর দ্বারা অনিত্যত্ব স্থাপনও করিলেন। তখন প্রতিবাদী মীমাংসকদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া শব্দের নিত্যত্বসাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিলে বাদী সেই পক্ষ খণ্ডন করিতে না পারিয়া যদি বলেন, "আচ্ছা, আমি শব্দকে

পরিত্যাগ করিয়া ঘটকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিলাম", তবে বাদীর প্রতিজ্ঞা-হানি-নামক নিগ্রহস্থান হইবে। এইরূপে অপর নিগ্রহস্থানেও পরাজয় সূচনা করে। বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে 'অপসিদ্ধান্ত' ও 'হেত্বাভাস' বাদকথাতেও প্রদর্শন করা চলে। জল্প ও বিতণ্ডাতে সকল নিগ্রহ-স্থানেরই উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। শাস্ত্রসংগত কোনো সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া আপন অভিমত সমর্থন করিবার সময় বিপক্ষের যুক্তিতর্কে যদি আপন অভিমত খণ্ডিত হইয়া যায়, তখন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে 'অপসিদ্ধান্ত' নামক নিগ্রহস্থান হইয়া থাকে।

অনুমান-প্রকরণে অনৈকান্ত প্রভৃতি হেত্বাভাসের আলোচনা করা হইয়াছে। বাদীর স্বপক্ষ স্থাপনের বেলায় বিপক্ষ, হেত্বাভাস প্রদর্শন করিলেও বাদীর নিগ্রহ হইয়া থাকে। এইকারণে হেত্বাভাসও নিগ্রহের হেতু।

নব্যন্যায়

বর্ণিত ষোলটি পদার্থ মহর্ষি গোতমের স্বীকৃত। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সম্প্রদায়পরম্পরায় এই ষোল পদার্থেরই তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। প্রাচীন কালে মিথিলাতেই ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র এবং মহানৈয়ায়িক আচার্য উদয়নের জন্মভূমিও মিথিলা। উদয়নাচার্যের পরে তাঁহারই সম্প্রদায়ে মিথিলাতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের আবির্ভাব। গঙ্গেশ প্রাচীন ন্যায়কে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে সাজাইয়া 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঙ্গেশের গ্রন্থরচনা বা নব্যন্যায়ের ভিত্তিপত্তন। (৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত।) গঙ্গেশের গ্রন্থেই অনেক অভিনব পারিভাষিক শব্দ প্রথমত স্থান পাইল। গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় এবং মৈথিল নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রই এই সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত

মৈথিল গ্রন্থকার। মিথিলায় 'তত্ত্বচিন্তামণি'র অনেক টীকাগ্রন্থ রচিত হইয়া গিয়াছে। 'তত্ত্বচিন্তামণি' পড়িবার জন্য সকল দেশ হইতেই বিদ্যার্থীরা মিথিলায় যাইতেন। বঙ্গদেশ হইতে বাসুদেব সার্বভৌমই প্রথম নব্যন্যায় পড়িবার উদ্দেশ্যে মিথিলায় যান। সার্বভৌমের ছাত্র বাঙালীর মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান রঘুনাথ মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রঘুনাথের উপাধি লাভ। (৺তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে।) পক্ষধর মিশ্র হইতে 'তার্কিকশিরোমণি' উপাধি লাভ করিয়া রঘুনাথ নবদ্বীপে আসিয়া নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'দীধিতি' নামে টীকা এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তখন হইতে নবদ্বীপই ন্যায়ালোচনার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। মিথিলার জ্যোতি ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকে। রঘুনাথের গ্রন্থেরও অনেক টীকা হইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার এবং গদাধর ভট্টাচার্যই নব্যন্যায়ের টীকাকাররূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। নব্যন্যায় বলিতে গঙ্গেশ, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধরের গ্রন্থরাজিকেই বুঝাইয়া থাকে। বঙ্গদেশে, বিশেষত নবদ্বীপে পরেও বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্যই বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের শেষ প্রখ্যাত গ্রন্থকার। ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, ১১১০ বঙ্গাব্দে ১০৫ বৎসর বয়সে গদাধর পরলোকে গমন করেন।

নব্যন্যায়ের ভাষা সাধারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে পৃথক্। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকিলেও নব্যন্যায়ের পরিভাষা জানিতে হইলে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। পরিভাষাবহুল বলিয়াই অসংখ্য সূক্ষ্ম বিচার অল্পসংখ্যক কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি অক্ষর ওজন করিয়া লেখা। কোথাও একটি অক্ষর বেশী লিখিত মনে হইলে টীকাকারগণ তাহারও সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

নব্য নৈয়ায়িকগণ গোতমের ষোড়শ পদার্থকে সাতটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা সপ্তপদার্থবাদী। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই সাতটি পদার্থ। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টি দ্রব্যবর্গের অন্তর্গত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ এই চব্বিশটি গুণপদার্থ। ঘটত্ব, পটত্ব, মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি নিত্যপদার্থ 'সামান্য' বা 'জাতি' নামে অভিহিত। সাবয়ব বস্তুগুলি আপন আপন আকৃতির বৈশিষ্ট্যেই পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু পরমাণুর আকৃতি বা অবয়ব না থাকায় পরস্পর ভেদের কোনো হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই কারণে বলিতে হয়, প্রত্যেক পরমাণুতে 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ আছে, ঐ 'বিশেষই' পরমাণুসমূহের পরস্পরের ভেদক। (পরমাণু সম্বন্ধে পরেই বলা হইবে।) আমের বীজ হইতে আম ভিন্ন অন্য গাছও জন্মিতে পারে, কারণ আম বীজের পরমাণু ও কাঁটাল বীজের পরমাণুর পরস্পর ভেদ আছে— ইহা কিরূপে জানা যায়? এই আপত্তি খণ্ডনের বেলায় বলিতে হয়, প্রত্যেক পরমাণুতে যে বিশেষ-পদার্থটি আছে, তাহাতেই পরমাণুর পরস্পর পৃথকত্ব সিদ্ধ হয়।

অবয়ব ও অবয়বী, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, নিত্যদ্রব্য পরমাণু ও বিশেষ— ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, তাহাই সমবায়-পদার্থ নামে খ্যাত।

অভাব-পদার্থ দুইপ্রকার, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব তিনপ্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব। যে বস্তু ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, বর্তমান কালে তাহার অভাব আছে, এই অভাবই সেইবস্তুর প্রাগভাব। বস্তুটি নাশ হইলে তাহার ধ্বংসাভাব হইয়া থাকে। যে সংসর্গাভাব নিত্য, তাহাই অত্যন্তাভাব। অন্যোন্যাভাবের অপর নাম

ভেদ। প্রত্যেক বস্তুতে অপর বস্তুর ভেদ বা অন্যোন্যাভাব থাকে, এই কারণে সকল বস্তুই পরস্পর ভিন্ন। নব্যন্যায়ে চারিটি অংশ আছে। প্রত্যক্ষখণ্ড, অনুমানখণ্ড, উপমানখণ্ড ও শব্দখণ্ড। নব্যন্যায়ের অনুমানখণ্ডকে দুই অংশে ভাগ করা হয়, ব্যাপ্তিবাদ ও জ্ঞানকাণ্ড। ব্যাপ্তিবাদে অনুমানের বিচার এবং জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের বিশেষ্যতা, বিশেষণতা, প্রতিবধ্যতা, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতির বিচার। সংস্কৃতভাষায় লিখিত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে নব্যন্যায় অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্মবিচার-বহুল। বিশেষত অনুমানখণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। নব্যন্যায় মিথিলা ও বাঙলার নিজস্ব কীর্তি, বাঙালীর দানেই নব্যন্যায় সমৃদ্ধ।

পরমাণু এবং আরম্ভবাদ বা অসৎকার্যবাদ

ন্যায়দর্শনের পরমাণুবাদ বৈশেষিকদর্শনেও পাওয়া যায়। অন্যান্য দর্শনসূত্রে পরমাণুবাদ সমর্থিত হয় নাই। ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে আকাশ, কাল, জীব এই সকল পদার্থ সর্বব্যাপী এবং নিত্য। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যের পরমাণু স্বীকার করা হয়। পরমাণু নিত্যপদার্থ, অতিশয় সূক্ষ্ম এবং সমস্ত উৎপত্তিশীল দ্রব্যের উপাদান। প্রত্যেক উৎপত্তিশীল সাবয়ব দ্রব্যকে বিভাগ করিতে করিতে তাহার শেষ অবিভাজ্য যে সূক্ষ্ম অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, যাহার আর ভাগ করা চলে না, সেই নিরবয়ব দ্রব্যই পরমাণু নামে কথিত। সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব বিভাগ করিতে করিতে কোথাও সমাপ্তি ঘটে না, এই প্রকার সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। তাহাতে হিমালয়পর্বত ও একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণাকে সমান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ হিমালয়েরও অবয়বের অন্ত নাই, যতই বিভাগ করা হউক না কেন, শেষ হইবে না। ধূলিকণাকেও যতই বিভাগ করা হউক না কেন শেষ হইবে না। এরূপ

বলিলে হিমালয়ের গুরুত্ব ও পরিমাণের সহিত প্রত্যেক ধূলিকণার গুরুত্ব ও পরিমাণের তুল্যত্বাপত্তি হয়। কিন্তু তাহা কি সত্য। সত্যের অপলাপ করিয়া কখনো এই উভয়ের তুল্যতা স্বীকার করা চলে না। এইরূপে সাবয়ব দ্রব্যগুলির গুরুত্ব ও পরিমাণ স্থির করিতে তাহাদের উপাদানরূপ পরমাণুর সংখ্যার আধিক্য ও ন্যূনতা দ্বারা স্থির করিতে হয়। সুতরাং বলিতে হইবে, সাবয়ব বস্তুর বিভাগ করিতে করিতে এরূপ ক্ষুদ্র অংশে পৌঁছানো যায়, যে অংশের আর বিভাগ করা চলে না। ঈশ্বরেচ্ছাবশত দুইটি পরমাণুর সংযোগ হইতে সর্বপ্রথম (খণ্ডপ্রলয়ের পরে নূতন সৃষ্টিতে) যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে দ্ব্যণুক বলে। তিনটি দ্ব্যণুক অর্থাৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ত্রসরেণু। সংসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল দ্রব্যের মধ্যে ত্রসরেণুই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ত্রসরেণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ তাহাতে মহৎ-পরিমাণ নাই। ত্রসরেণুর অপর নাম ত্রুটি। পরমাণু হইতেই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ত্রসরেণুর উপাদান-কারণ দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুকের উপাদান-কারণ পরমাণু। পরমাণুর কারণ থাকিতে পারে না, যেহেতু তাহা নিত্য। এই পরমাণু-কারণবাদকেই আরম্ভবাদ বলে। কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তাহার উপাদানকারণ পরমাণু বিদ্যমানই থাকে, কিন্তু উপাদানকারণ পরমাণুতে কার্যটি তখন থাকে না। অতএব যে কার্যটি অসৎ (অবিদ্যমান), সেই কার্যের উৎপত্তির নাম আরম্ভ। উৎপত্তির পূর্বে ঘট ছিল না, পরমাণুরূপ উপাদানকারণ হইতে ঘটরূপ অসৎ-কার্যের আরম্ভ হইল। এই অসৎ-কার্যবাদই আরম্ভ-বাদ। এক একটি খণ্ডপ্রলয়ের পরে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং জীবগণের অদৃষ্টবশত প্রথমে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া পরমাণুতেই জন্মে এবং পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইতে থাকে। জীবগণের অদৃষ্টরূপ প্রকৃতি বা মায়া যদিও স্বয়ং অচেতন,

তথাপি ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের বলে পরমাণুতে সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া উৎপন্ন করে। ক্রমে স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়।

ঈশ্বর

ন্যায়দর্শনে মহর্ষির পদার্থসংকলনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম নাই, কেন? তবে কি গোতম নিরীশ্বরবাদী, এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। ন্যায়সূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মাত্র তিনটি সূত্রে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তসূত্রে (তৎকারিতত্বাদহেতুঃ ৪।১।২১) মহর্ষি বলিয়াছেন, জীবের কর্ম এবং কর্মফলের নিয়ন্তা ঈশ্বর। সুতরাং শুধু ঈশ্বর অথবা শুধু কর্মফলরূপ অদৃষ্ট জগৎসৃষ্টির কারণ, তাহা বলা যায় না। কিন্তু জীবের কর্মফল ও ঈশ্বর দুইই জগতের সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। ঈশ্বর কর্মফল অনুসারে জীবের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বারটি প্রমেয়-পদার্থের মধ্যে মোক্ষ চরম প্রমেয়, আর আত্মা প্রথম প্রমেয়। আত্মা (জীব) মোক্ষের অধিগন্তা বা প্রাপক, মোক্ষ তাহার প্রাপ্য, উপেয় বা অধিগন্তব্য। শরীরাদি দশটি প্রমেয় দুঃখজনক বলিয়া মুমুক্ষুর পক্ষে পরিত্যাজ্য বা হেয়। ঈশ্বর অধিগন্তা, অধিগন্তব্য বা হেয় কিছুই নহেন। ন্যায়দর্শনের মতে জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন পদার্থ। মহর্ষি গোতম দ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদকে অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি যে বারটি পদার্থকে 'প্রমেয়' নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেইগুলির অযথার্থ জ্ঞানই সংসারের হেতু। ন্যায়মতে জীব ঈশ্বরের উপাসকমাত্র। ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান গোতমমতে মুক্তির কারণরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকিলেও যদি বারটি প্রমেয় বিষয়ের মিথ্যাজ্ঞান কাহারও তিরোহিত হয়, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবেন। প্রমেয়পদার্থের মননের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে এবং বিচারে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিয়া আপনার

তত্ত্বজ্ঞান রক্ষা করিবার নিমিত্ত জল্প, বিতণ্ডা প্রভৃতিরও উপযোগিতা আছে। কিন্তু অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক্‌ভাবে ঈশ্বরকে জানিবার আবশ্যকতা ন্যায়প্রস্থানে স্বীকৃত হয় নাই। বিশেষত মুক্তির বেলায় ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

প্রমেয়পদার্থের অন্তর্গত আত্মশব্দ জীবাত্মার এবং পরমাত্মার উভয়েরই বাচক। যদিও আত্মনিরূপণে ন্যায়দর্শনে জীবেরই তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি এই শব্দ পরমাত্মারও বোধক। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ের মধ্যেই আত্মত্ব ধর্মটি বিদ্যমান। প্রত্যেক বস্তু আপনার অসাধারণ ধর্মের দ্বারা অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। যেহেতু পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ের মধ্যেই আত্মত্ব ধর্মটি সাধারণভাবে আছে, সেইহেতু মহর্ষি শুধু আত্ম-শব্দের দ্বারা উভয়েরই সূচনা করিয়াছেন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গোতমের প্রমেয়বর্গের আত্ম-শব্দ যদি পরমাত্মারও বাচক হয়, তবে পরে মহর্ষি পরমাত্মবিষয়ক বিরুদ্ধ মতবাদের খণ্ডন করেন নাই কেন।

উত্তরে বলা যায়, কোনো বস্তুর বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে বিচারের দ্বারা তথ্য নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। আস্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যে তখন ঈশ্বর বিষয়ে কাহারও সন্দেহই ছিল না। আচার্য উদয়ন 'কুসুমাঞ্জলি'গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "আসংসারং সুপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ"— ইত্যাদি। তাৎপর্য এই যে, "ঈশ্বর সকলেরই স্বীকৃত, তাঁহার সম্বন্ধে কোনো সংশয় নাই। এই কারণে ঈশ্বর-নিরূপণের আবশ্যকতা না থাকিলেও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা ঈশ্বরের মননস্বরূপ উপাসনা বলিয়া আমি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

ন্যায়শাস্ত্রের ঈশ্বর বেদের কর্তা, অদৃষ্টের (পাপ-পুণ্যের) অধিষ্ঠাতা এবং সকল অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির অন্যতম নিমিত্তকারণ। এই তিন প্রকার যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব, বেদের এই চারিটি বিভাগ। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ প্রভৃতি অথর্ববেদের অন্তর্গত, ইহা সম্প্রদায়বিশেষের অভিমত। কেহ কেহ আয়ুর্বেদ প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। আয়ুর্বেদের যথাযথ চিকিৎসায় রোগ সারে এবং অথর্ববেদে বিষ-নাশক যে সকল মন্ত্র আছে, সেইগুলির যথার্থ প্রয়োগে বৃশ্চিকাদির বিষের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বেদের এইসকল অংশকে প্রমাণ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও কোনো আপত্তির কারণ নাই। বেদের যে অংশের সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই অংশকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া যে সকল অংশের উপদেশ বা অনুষ্ঠানের সত্যতা লৌকিক প্রণালীতে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ হয় না, সেই সকল অংশের সত্যতারও অনুমান করা যাইতে পারে। বেদের এক অংশ প্রমাণ, আর অন্য অংশ অপ্রমাণ, এরূপ কল্পনা করিবার সংগত কোনো কারণ নাই। যেহেতু প্রামাণ্য স্থাপনের মূলে যাহাকে হেতুরূপে স্বীকার করিতে হইবে, সেই হেতুর দ্বারা সমগ্র বেদেরই অভ্রান্ততা অনুমিত হইবে।

যদিও আংশিক প্রামাণ্য স্থির হইলেই অন্য অংশেরও প্রামাণ্য থাকিবে, এরূপ নিয়ম করা চলে না, কারণ কোনো গ্রন্থের অংশবিশেষ প্রমাণ হইলেও সেই গ্রন্থের অপর অংশে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকা অসম্ভব নহে, তথাপি বেদ সম্বন্ধে এইসকল সাধারণ নিয়ম খাটিবে না। বেদ গ্রন্থমাত্র নহে, পরন্তু গুরুশিষ্যপরম্পরায় সম্প্রদায়ক্রমে সুরক্ষিত যথার্থ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বেদ। মন্ত্র আয়ুর্বেদ প্রভৃতি অংশবিশেষের সত্যতার ফলে বেদের কর্তাকে সাধারণ গ্রন্থকারশ্রেণীর মধ্যে গণনা করা অনুচিত। বিশেষত বেদ কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে, কাহার দ্বারা কিভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনো প্রমাণ নাই। সুতরাং বেদের বক্তা নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সর্বজ্ঞ কোনো

অভ্রান্ত পুরুষ। শরীরধারী জীবের মধ্যে তাদৃশ কোনো পুরুষ আছেন, এরূপ প্রমাণ নাই। অতএব শ্রুতিসিদ্ধ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই বেদের কর্তা। বেদকর্তা ঈশ্বরের ভ্রমপ্রমাদাদি না থাকায় তাঁহার রচিত বেদ নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। মহর্ষি গোতম বেদপ্রামাণ্য স্থাপনে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেন নাই। "বেদ আপ্ত-পুরুষের বাক্য" এইমাত্র তাঁহার অভিমত। মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের উদাহরণে বেদের প্রামাণ্য। মহর্ষির সূত্র—

মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ। ২।১।৬৮

আপ্ত-শব্দের অর্থ ভ্রমপ্রমাদাদি-রহিত পুরুষ। ভাষ্যকার এবং বার্তিক-কারও বেদের কর্তা বলিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্র বার্তিককার উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য বর্ণনা করিতে বেদকে ঈশ্বরের রচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উদয়নাচার্য জয়ন্তভট্ট গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণও বাচস্পতি মিশ্রের অনুসরণ করিয়াছেন। আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ঐশ্বর্যশালী সর্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ সর্বজ্ঞানের প্রকাশক বহুবিধ অলৌকিক বিষয়ের প্রতিপাদক বেদ রচনা করিতে পারেন না। সমস্ত বিষয়ে যাঁহাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান নাই, তাঁহারা অলৌকিক তত্ত্বের উপদেশ দিবার অধিকারীই নহেন, তাঁহাদেব সকল বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করা যায় না। যদি বলা যায়, কপিল ব্যাস বশিষ্ঠ প্রমুখ মুনিঋষিগণ সর্বজ্ঞ, সুতরাং বেদের রচয়িতা, তাহাতে বেদের কর্তৃরূপে বহু পুরুষকে গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস্য। বিশেষত একজনকে কর্তা স্বীকার করিলেই চলিতে পারে, কেন বহু কর্তার কল্পনা করিয়া কল্পনাকে ভারাক্রান্ত করিব। শব্দ যেহেতু নিত্য নহে, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেইহেতু শব্দস্বরূপ বেদও নিশ্চয়ই নিত্য নহে। সর্ববিষয়ে নিত্য জ্ঞানবান্ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষ বেদের কর্তা

হইবেন, ইহা অসম্ভব। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বরের নিঃশ্বাসের মত প্রকাশিত, ইহা বৃহদারণ্যক-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। এইসকল যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা বেদের কর্তৃরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে।

অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা ও সংসারের নিমিত্তকারণরূপেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করা হয়। প্রত্যেক প্রাণী প্রতি মুহূর্তেই কোনো না কোনো কাজ করিতেছে, এক মুহূর্তও কেহ নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়া অনবরতই চলিতেছে। কাজ করিয়াও অনেক সময় অভিলষিত ফললাভ হয় না, সম্ভবত ইহা সকলেই অল্পবিস্তর অনুভব করিয়া থাকিবেন। ফল না হইলেই কল্পনা করিতে হইবে, কেবল কর্ম অন্য কিছুর সহায়তা ব্যতীত ফল প্রদানে সমর্থ নহে ; আরও একটি সহকারী কারণ নিশ্চয়ই আছে। অনুসন্ধানে দৃশ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সেই কারণকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব অদৃশ্য সেই কারণকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জীবের কর্মফল-প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। ঈশ্বর সকল প্রাণীকেই একভাবে দেখিয়া থাকেন, তাঁহার শত্রুও নাই, মিত্রও নাই। "সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"। (গীতা ৯।২৯) তিনি পক্ষপাতিত্ব করিয়া কাহাকেও রাজা আর কাহাকেও পথের ভিখারী করিবেন, এই কল্পনা অসংগত। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, প্রাণীদের বিচিত্র কর্ম অনুসারেই তিনি এই বিচিত্র সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব আপন কর্ম অনুসারে ফলভোগ করিতেছে, ঈশ্বর নিমিত্তমাত্র। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, সুতরাং প্রথম সৃষ্টিতে বৈষম্য কেন হইল, এই প্রশ্নই দার্শনিকগণ শুনিবেন না। এই প্রশ্ন এড়াইবার জন্য সকল দার্শনিকই সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিতা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিতে জীবের কর্মফলেরই প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন।" (৪।৪।৫) ইহাতে বুঝা যায়,

জীবই সমস্ত করে, ঈশ্বর জীবের কর্ম অনুসারে ফল দান করেন। ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরানুমান-চিন্তামণি' এবং উদয়নাচার্যের 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'-গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। উদয়নাচার্য নিরুক্তের একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "অন্ধব্যক্তি বৃক্ষের কাণ্ড দেখিতে পায় না, ইহা কি বৃক্ষের অপরাধ।" অর্থাৎ সাধক পুরুষগণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, যাহারা অজ্ঞানান্ধ, তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারে না, ইহা তাহাদেরই সাধনার অভাবে, ঈশ্বর সেইজন্য দায়ী নহেন। উদয়নাচার্য আরও বলিয়াছেন—

কার্যায়োজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ।
বাক্যাৎ সংখ্যা-বিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদব্যয়ঃ। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ৫।১

১. কার্যদ্বারা ভগবানের অনুমান করা যায়। স্রষ্টা না থাকিলে কোনো বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। এই বিশাল বিশ্বের কারণরূপেও নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা আছেন। তিনিই ঈশ্বর।

২. অনিত্য সৃষ্টির উপাদান যে পরমাণু, তাহা অচেতন বলিয়া সৃষ্টির প্রারম্ভে পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং নিশ্চয়ই কোনো অদৃশ্য শক্তি ঐগুলির মধ্যে পরস্পরের সংযোগ জন্মাইয়া স্থূল সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকেন। এই কর্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'আয়োজন'।

৩. যে সকল বস্তুর গুরুত্ব (ওজন) আছে, সেইগুলি শূন্যে থাকিতে পারে না। প্রভূত গুরুত্ববিশিষ্ট এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নিরন্তর নিম্নের দিকে পতনোন্মুখ, তাহার অবস্থিতি বা অপতন-রূপ ধৃতি দেখিয়া বিশ্বের মূলে একটি অচিন্ত্য শক্তির লীলা কল্পনা করিতে হয়। এই অপতনরূপ ধৃতি হইতে ঈশ্বরের অনুমান করা যায়। সংসারের স্থিতি দেখিয়া যেমন তাহার মূলে একটি শক্তির অস্তিত্বের অনুমান করা যায়, সেইরূপ ক্রমিক ধ্বংস দেখিয়াও সংসারের বিনাশের মূলে কাহারও কর্তৃত্বের অনুমান করা যাইতে পারে।

৪. সকল বস্তুর নাম বা সংজ্ঞা, নির্মাণপ্রণালী, তদ্‌বিষয়ে উপদেশ প্রভৃতি অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইগুলির মূলে নিশ্চয়ই কেহ আছেন, সেই অদৃশ্য পুরুষই ঈশ্বর।

৫. বেদে যে সকল অনুষ্ঠানাদির বিষয় আছে, সেইগুলির যথাযথ প্রয়োগে তাহাদের সত্যতার উপলব্ধি হয়। সুতরাং আদি বেদবক্তৃরূপে কোনো অভ্রান্ত পুরুষের সত্তা মানিয়া লইতে হয়। সেই পুরুষই ঈশ্বর।

৬. রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতার নাম জানা যায়। বেদও কতকগুলি উপদেশের সমষ্টি। সুতরাং নিশ্চয়ই কেহ বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন। মর্ত্যলোকের কোনো পুরুষকে বেদের কর্তা বলিয়া জানা যায় না। অতএব বেদকর্তৃরূপে তাঁহার অস্তিত্ব স্থির করা যাইতে পারে।

৭. দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি, তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইলে তাহার নাম ত্রসরেণু। ত্রসরেণুর পরস্পর মিলনে স্থূল সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। দ্ব্যণুকের পরিমাণ সংখ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। এক একবার খণ্ড-প্রলয়ের পর যখন নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন পরমাণুর সংখ্যা হইতে দ্ব্যণুকের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। পরমাণু অতীন্দ্রিয়-পদার্থ, সুতরাং তাহার সংখ্যাও আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। "এক আর এক দুই, দুই আর এক তিন" এই প্রকার আপেক্ষিক জ্ঞান হইতে সংখ্যার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দ্ব্যণুকের উৎপত্তির বেলায় পরমাণুর দ্বিত্বসংখ্যা আমাদের জ্ঞান-গোচর না হইলেও নিশ্চয়ই কাহারও সেই জ্ঞান হইয়া থাকে, যিনি সেই জ্ঞানের আশ্রয়, তিনিই ঈশ্বর।

আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পরমাত্মার খণ্ডন করিবার সময়ে পুনঃ পুনঃ তাঁহারই চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, অনিত্য

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, এই কারণে তাঁহার বিষয়ে পরিষ্কার কোনো ধারণাও করিতে পারি না, কিন্তু বিশ্বের মূলে অচিন্ত্য অনির্বচনীয় শক্তিবিশেষের সত্তাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই। সেই শক্তিকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভগবান্ প্রভৃতি নামে প্রকাশ করা হয়। অনুমান-প্রমাণ ব্যতীত শ্রুতিতেও বহুস্থানে তাঁহারই মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে, "দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা" ইত্যাদি।

প্রাগুক্ত অনুমানাদির দ্বারা ঈশ্বর নিরূপিত হইলে কতকগুলি আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত আপনা-আপনিই উপস্থিত হয়। প্রত্যেক বস্তুর নির্মাণকার্যে সেই বস্তুর উপাদানাদি বিষয়ে নির্মাতার যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অচেতন পরমাণুসমূহ দ্বারা যিনি নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাঁহার ইচ্ছা, বুদ্ধি, প্রযত্ন প্রভৃতি অনন্যসাধারণ। সেই বিশ্বকর্মাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ"। ন্যায়শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর সগুণ, তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি নিত্য। নৈয়ায়িকগণ বেদান্তসম্মত নির্গুণ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলিকে সগুণব্রহ্ম-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ন্যায়মঞ্জরীকার ঈশ্বরকে নিত্য-সুখের আশ্রয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, যিনি প্রকৃতপক্ষে সুখী নহেন, এতবড়ো বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই তাঁহার হইতে পারে না। সৃষ্টি আনন্দেরই প্রকাশমাত্র। নৈয়ায়িকগণ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের ধার না ধারিয়া কেবল তর্কের দ্বারা ঈশ্বর স্থাপন করেন নাই। সকল আচার্যই তর্কের পরিপোষকরূপে অনুকূল শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঈশ্বরের বাক্যরূপে নৈয়ায়িকগণ বেদকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে ঈশ্বরস্থাপনে তাঁহারই বাক্যকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা অসংগত বিবেচনায়, প্রথমত অনুমানের আশ্রয়

লইয়াছেন। পরে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের অনুমান শাস্ত্রবিরোধী কুতর্কমাত্র নহে।

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই স্রষ্টা নহেন। বিশ্বসৃষ্টিতে তাঁহার কী প্রয়োজন। প্রয়োজন ব্যতীত নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তিও কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানবান্ হইয়াও কেন লক্ষ্য-হীনভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। এই আপত্তির উত্তরে কোনো কোনো আচার্য বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর বিশ্বের পিতা, পরম সুহৃৎ, আপনার প্রয়োজন না থাকিলেও জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদেরই উপভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। জীব সুদীর্ঘকাল নানা কর্মের ফলভোগ করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন তিনি পিতার ন্যায় আদর করিয়া জীবগণের বিশ্রামের নিমিত্ত সাময়িকভাবে বিশ্বের সংহার বা প্রলয় ঘটাইয়া থাকেন। সকলই তাঁহার দয়া।

বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বর্ণিত আপত্তির উত্তরে দুইটি মতের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথম মত, ঈশ্বর ক্রীড়া করিবার উদ্দেশ্যে জগতের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় মত, আপনার বিভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বার্তিককার বলেন, এই উভয় পক্ষই অসংগত। কারণ, যাঁহারা ক্রীড়া ব্যতীত আনন্দ লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারাই আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে নানাবিধ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন। দুঃখে যাঁহাদের সময় কাটিতেছে, তাঁহারাই সাময়িক সুখের আশায় খেলাধুলায় রত হন। পরমেশ্বর নিত্য-আনন্দময়, তিনি কেন খেলা করিতে যাইবেন। তিনি বিভূতি প্রদর্শন করিতেই বা কেন যাইবেন। অপরের সহিত তুলনায় আপনার উৎকর্ষ দেখাইতে মানুষ জাঁকজমক প্রকাশ করে। ঈশ্বর তো জানেন, তিনি কাহারও অপেক্ষা কম নহেন, তিনি আপ্তকাম। কোন্ স্বার্থে তিনি বিভূতি দেখাইতে যাইবেন। অতএব প্রাগুক্ত দুইটি অভিমতের কোনোটিই ঠিক নহে।

ঈশ্বর স্বভাবত প্রবৃত্তিপ্রবণ, কাজ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার আচরণের সমালোচনা করিবার অধিকার আমাদের নাই। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি। ৩।২২

তিনি কেবল জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই কার্যে লিপ্ত থাকেন। এখানে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, দয়ালু সহৃদয় মহাত্মা নিজে দুঃখীর দুঃখ অনুভব করিয়াই দুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হন, পরমেশ্বর যদি জীবের প্রতি কৃপা করিয়াই সৃষ্টি করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনিও জীবের দুঃখে দুঃখিত হন। ঈশ্বরের দুঃখ আছে, এই কল্পনা নিতান্তই শ্রুতিবিরুদ্ধ। উত্তরে আচার্যগণ বলিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময় হইলেও দুঃখের কারণরূপ দুরদৃষ্ট না থাকায় তাঁহার দুঃখ আছে এই কল্পনা করা যায় না। কারুণিক হইলেই তিনি পরের দুঃখ নিজে অনুভব করিবেন, এরূপ কোনো প্রমাণ নাই।

যে-সকল সম্প্রদায় ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানেন না, তাঁহাদের একটি আপত্তি এই যে, ঘটপটাদি সমস্ত সৃষ্টিতেই নির্মাতার শরীর থাকা প্রয়োজন, ইহা প্রত্যক্ষসত্য। ঈশ্বর যদি জগতের স্রষ্টা হন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার শরীর থাকিবে। এইভাবে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বের অনুমান-প্রণালীর খণ্ডন করিয়া থাকেন। বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য প্রমুখ আচার্যগণ এই আপত্তির বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, শরীরবত্তা আর কর্তৃত্বের মধ্যে এরূপ কোনো ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নাই। কার্যের অনুকূল প্রযত্নবত্তা এবং কর্তৃত্ব একই পদার্থ। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও তাঁহার প্রযত্ন থাকিতে পারে। তিনি সর্বশক্তিমান্, সুতরাং অশরীরী হইয়াও শুধু ইচ্ছার শক্তিতে সমস্তই করিতে পারেন। দুই হাত দিয়া

কেহ যে বস্তু অতি কষ্টে উত্তোলন করিয়া থাকেন, তাহাই কেহ এক হাত দিয়া, কেহ বা এক অঙ্গুলি দিয়া উত্তোলন করিতে পারেন। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, যিনি সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে শরীর ছাড়াও সমস্তই করিতে পারেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

তাঁহার পা নাই, কিন্তু চলিতে পারেন; হাত নাই, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারেন; চক্ষু নাই, তথাপি দেখিতে পারেন; কান নাই, তথাপি শুনিতে পারেন। অতএব অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে শুধু লৌকিক যুক্তিতে সমস্ত বুঝিতে পারা যায় না।

পাপ-পুণ্যরূপ অদৃষ্ট ঈশ্বরের নাই, তথাপি জীবগণের অদৃষ্টবশত কদাচিৎ তিনি শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই অবস্থাকে 'অবতার' বলা হয়। উল্লিখিত অভিমতকে সমর্থন করিতে আচার্য উদয়ন নিম্নের গীতাবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪।৭

আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন, নৈয়ায়িকগণ নাকি সাধারণতঃ নাস্তিক্যভাবাপন্ন, তাঁহাদের এই ধারণা নিতান্তই অজ্ঞতামূলক। তাঁহারা খাঁটি নৈয়ায়িক পণ্ডিত দেখেন নাই। বিতণ্ডামল্ল পাণ্ডিত্যাভিমানী কু-তার্কিককে দেখিয়াই তাঁহারা এই ধারণা পোষণ করেন। ন্যায়শাস্ত্রের সহিত ভক্তিমার্গের কোনো বিরোধ নাই, বরং ন্যায়শাস্ত্র ভক্তিমার্গের অনুকূল। ন্যায়শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ গৃহীত হইয়াছে। জীব উপাসক, ঈশ্বর জীবের উপাস্য।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ